প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

১/এ, ও.আর. নিজাম রোড, প্রবর্তক মোড়, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। ফোন: +৮৮-০৩১-৬৫৬৬১২-১৫, ৬৫৬৯১৭, ৬৫৭৬৫৪
ই-মেইল: info@puc.ac.bd, ওয়েবসাইট: www.puc.ac.bd, www.facebook.com/PremierUniversityChittagong

মুজিববর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ সংখ্যা

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম

মুজিববর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মরণে
শ্রদ্ধার্ঘ সংখ্যা, মার্চ ২০২০

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম

মুজিববর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মরণে

শ্রদ্ধার্ঘ সংখ্যা, মার্চ ২০২০

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম

মুজিববর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্মরণে
শ্রদ্ধার্ঘ সংখ্যা, মার্চ ২০২০

উপদেষ্টা
প্রফেসর ড. অনুপম সেন
উপাচার্য
প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

সম্পাদক
অমল ভূষণ নাগ
অধ্যাপক
ব্যবসা-শিক্ষা অনুষদ
প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

সহযোগী সম্পাদক
খুরশিদুর রহমান
রেজিস্ট্রার
প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

সহকারী সম্পাদক
শামসুল আরেফীন
সহকারী জনসংযোগ কর্মকর্তা
প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

প্রকাশনায়
জনসংযোগ শাখা, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি
১/এ, ও.আর. নিজাম রোড, প্রবর্তক মোড়, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
ফোন: +৮৮-০৩১-৬৫৬৬১২-১৫, ৬৫৬৯১৭, ৬৫৭৬৫৪,
ই-মেইল: info@puc.ac.bd
ওয়েবসাইট : www.puc.ac.bd
www.facebook.com/PremierUniversityChittagong

সম্পাদকীয়

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরে বাঙালি জাতি তাদের কাঙ্ক্ষিত এক মহামানবের দেখা পায়। তিনি আর কেউ নন–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জে জন্মগ্রহণকারী শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের আগেই রাজনীতিতে যুক্ত হন। পাকিস্তানের জন্মের পরে সূচিত বাংলা ভাষা আন্দোলনে তিনি জড়িত হয়ে গ্রেপ্তার হন। একথা আজ অকাট্য সত্য যে, ভাষা আন্দোলনের অবধারিত পরিণতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বের মাধ্যমে বাঙালিকে মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। মুক্তিযুদ্ধ মূলত ৬ দফার পথ ধরেই সংঘটিত হয়। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে বঙ্গবন্ধু বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে ৬ দফা ঘোষণা করেন। ৬ দফায় দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অবয়ব ফুটে উঠেছিল। এই ৬ দফা ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির সনদ। তখন কোন দলই এই ৬ দফা গ্রহণ করেনি। পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে এই ৬ দফা ঘোষণা করেন। আইয়ুব খান বলেছিলেন: শেখ মুজিবকে ৬ দফা প্রত্যাহার করতেই হবে। অন্যথা তাঁকে যুক্তির ভাষা নয়, অস্ত্রের ভাষায় বোঝানো হবে। ফলত বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা মামলার আসামি করা হয়। তারপর ৬ দফার সূত্র ধরে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত ও '৭০-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় লাভ করা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি। বরং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে পাকিস্তানিরা বাংলাদেশের মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ রাত ১২টার পরে পাকিস্তানিদের কাছে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপর দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় বিজয়।

মুক্তিযুদ্ধের পরে বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন। বাংলাদেশের মানুষ তাঁকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির পিতা হিসেবে বরণ করে নেয়। তিনি দেশে ফিরে বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ

করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, কতিপয় বিপথগামী বাঙালি সেনা অফিসার তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায়, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে রাতের আঁধারে হত্যা করে। বাঙালির এই লজ্জা কোনদিন ঘুচবে না।

আজ ১৭ মার্চ ২০২০, সেই মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। এ উপলক্ষে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। তাঁর স্মরণে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত হলো শ্রদ্ধার্ঘ সংখ্যা।

(অধ্যাপক অমল ভূষণ নাগ)
সম্পাদক

সূচি

৭ মার্চের ভাষণ: মহাকালে অনশ্বর একটি মহাকাব্যিক ভাষণ- অনুপম সেন ০৭
ট্র্যাজিক নায়ক বঙ্গবন্ধু- প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম ১০
বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন- শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম ১৭
জননায়ক বঙ্গবন্ধু- সাদাত জামান খান ২৩
কেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলেন জাতির পিতা?- সঞ্জয় বিশ্বাস ২৫
শেখ মুজিবুর রহমান: তাঁর প্রিয় গায়ক এবং গান- রুমানা চৌধুরী ২৭
বঙ্গবন্ধু ও নিউক্লিয়াস- মিনহাজ হোসাইন ২৯
সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন- ফারিয়া হোসেন বর্ষা ৩৪
অসমাপ্ত আত্মজীবনী: আলোচনা-সমালোচনা- জয়নব তাবাসসুম বানু সোনালী ৩৭
বঙ্গবন্ধুই হোক তারুণ্যের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ- আলী প্রয়াস ৪১
পরাধীন বাঙালির ত্রাণকর্তা- শামসুল আরেফীন ৪৪
বঙ্গবন্ধু- অনিন্দিতা দাস মিমি ৪৮
তরুণ প্রজন্মের চোখে শেখ মুজিব- হুমায়ুন কবির রাসেল ৫২
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবনপঞ্জি- মোছাম্মৎ মেহেরুন্নেছা বেগম ৫৪
বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত হাতে আঁকা চিত্র 'সূর্যমুখী'- লুবাবা নাওয়াল আলম ৬১

গল্প
বঙ্গবন্ধু ও মকবুল- আবদুল মজিদ শাকিব ৬২

কবিতা
মুজিব- আবদুর রহিম ৬৪
শেখ মুজিবুর রহমান তোমার কীর্তিগাথা চিরবহমান- অনুপ কুমার বিশ্বাস ৬৬
প্রিয় নেতা, শুভ জন্মদিন- হোমায়রা নওশীন উর্মি ৬৮

৭ মার্চের ভাষণ:
মহাকালে অনশ্বর একটি মহাকাব্যিক ভাষণ–

অনুপম সেন

বিশ্ব-ইতিহাসে যে কয়টি অসাধারণ বক্তৃতা আছে, ১৯৭১-এর ৭ মার্চ প্রায় দশ লক্ষ লোকের সামনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু যে-ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা তার অন্যতম, সম্ভবত শ্রেষ্ঠতম। আর কোন স্মরণীয় ভাষণের বক্তা এরকম একটি বিশাল জনসমুদ্রে তাৎক্ষণিক শব্দচয়নের মাধ্যমে এমন একটি মহাকাব্যিক ভাষণ দেন্‌নি। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে, আলেক্সান্ডারের পিতা ফিলিপের হাতে যখন একে একে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রগুলোর পতন ঘটছিল, তখন ডেমোস্থেনিস নগররাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের স্বাধীনতা হারানোর আশু অশনিসংকেত নির্দেশ করে যে-ভাষণগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলো বিশ্ব-ইতিহাসে স্মরণীয়। সেসব ভাষণের বিভিন্ন অংশ সংরক্ষিত আছে, কালের সীমানা পেরিয়ে সেগুলো আজো আমাদের উদ্দীপ্ত করে। যিশুখ্রিষ্টের জন্মের প্রায় চারশ বছর আগে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে ত্রিশ বছর ধরে যে-যুদ্ধ চলেছিল, যা পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ নামে পরিচিত- সে-যুদ্ধের এক পর্যায়ে এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক, গণতন্ত্রের অবিস্মরণীয় পূজারী পেরিক্লিস যে-মৃত্যুঞ্জয়ী, কালজয়ী ভাষণটি দিয়েছিলেন, তা আজো গণতন্ত্রের প্রতি গভীর ভালোবাসার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার চিরন্তন অগ্নিশিখা হিসেবে ইতিহাসকে আলোকিত করছে। বিশ্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিদ থুকিডাইডস এ-ভাষণটি রক্ষা ও লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাঁর অমর গ্রন্থ 'পেলোপনেসিয়ান ওয়ারস' বা 'পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধ'-এর ইতিহাসে। আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ বক্তৃতা বহু-উদ্ধৃত, বহু-নন্দিত যদিও তা উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে তাৎক্ষণিক কোন আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। নেতাজী সুভাষ বোস ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতীয়দের নিয়ে ভারতের বাইরে, অর্থাৎ বিদেশের মাটিতে 'ভারতীয় জাতীয় বাহিনী' বা Indian National Army গঠন করে সে-বাহিনীর সদস্য ও আপামর ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বেতারের মাধ্যমে 'আমাকে তোমরা রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব' বলে ভারতীয় জনগণকে আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করতে যে-ভাষণ দিয়েছিলেন, তা- এক চিরঅম্লান, চিরউজ্জ্বল ভাষণ। এসব ভাষণ জনচিত্তে যে-দোলা জাগিয়েছিল, তার রেশ আজো আমরা অনুভব করি।

কিন্তু কেন জানি মনে হয়, ৭ মার্চ অপরাহ্নে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে পড়ছে, তখন লক্ষ লক্ষ লোকের বিশাল জনসমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু যে-ভাষণটি দিয়েছিলেন, তার তুলনা যেন ইতিহাসের কোথাও নেই।

পেরিক্লিস, আব্রাহাম লিংকন এবং অন্যান্য মহৎ জাতীয় নেতা ও রাষ্ট্রনায়কগণ যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন, তা কোন জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে নয়, সেসব ভাষণে কোন একটা জাতিকে হাজার বছরের শৃঙ্খল ভেঙে পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধে, মুক্তির সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়নি। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণে বাঙালি যেন হঠাৎ করে তার হাজার বছরের জড়তা, দৈন্য ও গ্লানি অতিক্রম করে এক মহাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজন্ম সাধন-ধন, আজন্ম-অধরা স্বাধীনতাকে পাওয়ার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদাত্ত দীক্ষা পেল। রবীন্দ্রনাথ একদিন দুঃখ করে লিখেছিলেন, 'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি'। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে বাঙালি বিক্ষিপ্তভাবে জাগার চেষ্টা করলেও তা পূর্ণতা পায়নি। ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশের সাতকোটি মানুষকে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি বিত্ত-বৈভবের বিভাজন নির্বিশেষে এক মহাঐক্যে জাগ্রত করলেন এক মহাভাষণের মাধ্যমে। এই মহাভাষণের পটভূমি তিনিই তৈরি করেছিলেন তাঁর দীর্ঘ তেইশ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য-দিয়ে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৮- দীর্ঘ এই দুই দশকে তিনি যে অসংখ্যবার বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য জেলে গেছেন, তা বাঙালি-মননে অগ্নিশিখার মতো কাজ করেছিল। ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল তাই তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামের একটি পরিণত ফুল ও ফল। এই-ভাষণটি তিনি শুরুই করেছেন পাকিস্তানি শাসকচক্রের হাতে তেইশ বছরের মহাবঞ্চনার ইতিহাস উপস্থাপনের মাধ্যমে। শ্রোতার মর্মমূলকে বিদ্ধ করে তার মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত হানে–এরকম ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগ করে তিনি তাদের জানিয়েছিলেন তেইশ বছরের অত্যাচারের ইতিহাস, অধিকার-হরণের ইতিহাস, বঞ্চনার ইতিহাস; এককথায়, বাঙালি জাতির সার্বিক পরাধীনতার ইতিহাস। কতবার যে বাঙালির রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে, তা তিনি তাদের বলতে ভোলেননি; বলেছেন, অপরূপ গদ্যছন্দে। তেইশ বছরের বঞ্চনা সত্ত্বেও বাঙালি যে সবসময় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিকে অনুসরণ করেছে, তার প্রতি তিনি প্রথমেই দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বলেছেন, বাঙালিকে তার প্রাপ্য যদি দেওয়া হয়, তাহলে বাঙালি এখনো বহু আত্মত্যাগ সত্ত্বেও দেয়া-নেয়ায়, দান-প্রতিদানে রাজি আছে। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের শঠতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ষড়যন্ত্র চলছে'। ষড়যন্ত্র যদি চলে তাহলে বাঙালির কী করণীয় সে সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দিলেন, ডাক দিলেন, দেশজুড়ে হরতাল পালনের ও সরকারের সঙ্গে অসহযোগের। তিনি বললেন, তাঁর কাছে প্রধানমন্ত্রীত্ব নয়, মানুষের অধিকারই মুখ্য, বাঙালির মুক্তিই সর্বাগ্রগণ্য।

অধিকার হরণের ষড়যন্ত্রকে রুখতে অধিকার আদায়ে বাঙালির করণীয় কী–তাও তিনি বললেন, যা প্রকৃতপক্ষে ছিল স্বাধীনতারই ঘোষণা। বললেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে'। সব মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য লৌকিক বাক্য প্রয়োগ করলেন, যার অনন্য উপমা: . . . 'এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবা'। সাধারণ মানুষকে জাগাতে সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের ব্যবহৃত বাক্যের কী অসাধারণ প্রয়োগ! বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

এইজন্য অসাধারণ যে এই ভাষণে তিনি বাঙালিকে তার হাজার বছরের বঞ্চনা, অবমাননা, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করতে ডাক দিয়েছিলেন।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হেগেল বলেছেন, 'বিশ্ব-ইতিহাস মানুষের স্বাধীনতার চৈতন্যের অগ্রগতির ইতিহাস' ('The history of the world is none other than the progress of the consciousness of freedom'- Hegel, The philosophy of History)। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক সত্তার যৌক্তিক পরিণতি হলো তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে পূর্ণতা দেওয়া স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে। অচেতন যে সত্তা, যেমন একটি পাথর পাথরই থাকে, রোদে-পুড়ে জলে-ভিজে হাওয়ায়-শুকিয়ে পরিবেশের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। একটি বীজ যখন মহীরুহে পরিণত হয়, তার আগে তাকে বিভিন্ন প্রতিকূল প্রতিবেশ ও পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। না-বীজ-কুঁড়ি, না-কুঁড়ি-না-ফুল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একটি গাছ বিকশিত হয়। তাঁর মতে, এটি একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া। পাথরের ব্যাপারটি অচেতন, কিন্তু উদ্ভিদে বা গাছে রয়েছে চেতনার মধ্য দিয়ে স্বতস্ফূর্ত স্বয়ং প্রকাশ। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কোন যুক্তির তাড়না নেই। সংগ্রামটি অচেতন, সচেতন নয়। মানুষের ক্ষেত্রে তা সচেতন। কিন্তু মানুষ-এর মানুষ হয়ে উঠতে হলে, নিজের অসীম সম্ভাবনাকে পূর্ণতা দিতে হলে, প্রয়োজন স্বাধীনতা। যে মানুষ অধীন, সে-তো তার সম্ভাবনাকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে পূর্ণতা দিতে পারেনা। এইসব অধিকার-বঞ্চিত মানুষতো তার মানবিক সত্তার সব সম্ভাবনাকে পূর্ণতা দিতে ব্যর্থ। এইজন্য, বঙ্গবন্ধু যখন তাঁর ভাষণের শেষ বাক্য উচ্চারণ করলেন, ঘোষণা দিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' তখন তা হল একটি অসাধারণ মহাকাব্যিক উচ্চারণ। কারণ, তখন তাতে একটি মহাজাতির হাজার বছরের অপূর্ণ সম্ভাবনাকে পূর্ণতা দেওয়ার ঘোষণা এল। হাজার বছরের সুষুপ্তি ভেঙে বাঙালিকে মরণপণ জনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে যে ডাক দিলেন তিনি- 'যে শুনেছে কানে/তাহার আহ্বানগীত/ছুটেছে সে নির্ভিক পরাণে/দিয়েছে সে বিশ্ব-বিসর্জন/মৃত্যুর গর্জন/শুনেছে সে সঙ্গীতের মত'– সে-আহ্বানে, মৃত্যুর গর্জনকে সঙ্গীতের মূর্ছনার মতো শুনে, নির্ভিক চিত্তে বাঙালি ১৯৭১-এ যেভাবে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার তুলনা-কি কোথাও আছে? মহাকাল-ছাপিয়ে এই মহাকাব্যিক ভাষণ-কি তাই চির-অম্লান নয়!

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ; উপাচার্য, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

ট্র্যাজিক নায়ক বঙ্গবন্ধু

প্রফেসর ড. মোহীত উল আলম

২০২০ সালে বাংলাদেশ ৪৯ বছর পূরণ করল। আজকের বাংলাদেশ পৃথিবীকে স্বাগতম জানাতে পারে এ বলে যে, যাকে একদিন তলাবিহীন ঝুড়ি বলা হয়েছিলো, তার এখন ঝুড়ির তলাতো হয়েছেই, এমনকি অর্থনৈতিকভাবে ৮ শতাংশের কাছাকাছি দৌড়াচ্ছে এর প্রবৃদ্ধির হার। এ সাফল্য আগে আমাদের জন্য ছিল অনাস্বাদিত। একটি ভিডিও দেখলাম, পতেঙ্গা সমুদ্রতীরের উন্নতি। রাত দু'টোর সময়ও মহিলা পর্যটক পর্যন্ত নির্বাধে বিপুল আধুনিকায়িত এ সমুদ্রতটে হাঁটতে পারছে। এরকম উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উল্লেখ এখন শত শত দেওয়া যাবে।

কিন্তু এ অতীব আনন্দের মধ্যেও জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কথা স্মরণ করতে চাই, কারণ বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান নির্ণীত হওয়া উচিৎ ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশক হিসেবে। বঙ্গবন্ধু তাঁর মৃত্যুর সময় হয়তো আট-নয় কোটি লোকের নয়নের মণি ছিলেন। কিন্তু অসম্ভব মনে হলেও তাঁর মৃত্যুটা হয়েছিলো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। এখনও বাংলাদেশ ষড়যন্ত্র মুক্ত হয়েছে এ কথা ভাবা ঠিক নয়। সে জন্য এ লেখায় আমি চেষ্টা করেছি দু'টো উদ্দেশ্যকে তুলে ধরতে। এক, বঙ্গবন্ধুর জীবনটাকে আমি মহৎ ট্র্যাজিক নায়কের জীবন হিসেবে সৃজনশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত দেখতে চাই। দুই, ষড়যন্ত্রের ঠিকুজি বের করে আমি ভবিষ্যতের জন্যও একটি সতর্কতার বাতাবরণ তৈরি করতে চাই। লেখাটিতে এ কথাটি বলতে চেয়েছি যে, যদিও বঙ্গবন্ধু ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন, তবে এ শিকার হবার কিছু কিছু আলামত বঙ্গবন্ধুর নিজের অজান্তেই তৈরি হয়ে গেছিলো কিনা, হলে সেগুলি কিভাবে হলো, এবং সে সম্পর্কে সজাগ হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়া। সময়কে যখন সবচেয়ে বেশি নিরাপদ মনে হয়, তখন সবচেয়ে বড় অঘটনটি ঘটতে পারে। ১৫ মার্চ নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ শহরে দু'টো মসজিদের ওপর শ্বেতসন্ত্রাসী হামলাই তার বড় প্রমাণ।

১.

১৫ মার্চ, খ্রিষ্টপূর্ব ৪৪ সাল; জুলাই ২, ১৭৫৭ এবং আগস্ট ১৫, ১৯৭৫। প্রথম উল্লেখিত তারিখে একদল রোমান সিনেটর ব্রুটাসের নেতৃত্বে জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর। দ্বিতীয় উল্লেখিত তারিখে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করে মোহাম্মদ আলী বেগ। তাঁকে আদেশ দেন মীর জাফরের ছেলে মীরন। সিরাজের বয়স তখন কেবল ২৪। আর শেষ উল্লেখিত তারিখে কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে সপরিবারে নিহত হন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল, সিজারের মতোই, ৫৫।

আমার এ লেখাটি কাল্পনিকভাবে বঙ্গবন্ধুর জীবনকে অবলম্বন করে কিভাবে মহৎ সাহিত্য তৈরি হতে পারে তারই ঠিকুজি নির্ণয় করার খুবই বিনয়ী একটা চেষ্টা। বিশ্বাসঘাতকতা থিমের ওপর সাহিত্য বহু রচিত হয়েছে, তার মধ্যে সিজার এবং সিরাজের ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ট্র্যাজিক চরিত্র খুব মেলে। সিজারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক অনুজ সঙ্গী ব্রুটাস। ব্রুটাসকে কোন কোন ইতিহাসবিদ সিজারের জারজ পুত্র হিসেবেও দাঁড় করিয়েছেন। আর সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে চাচা সেনাপতি মীর জাফর আলী খান। সিজার এবং সিরাজ-এ দুই ঐতিহাসিক চরিত্র সাহিত্যে রূপায়িত হয়ে অবিস্মরণীয় ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত হয়েছেন, আর পাশাপাশি ব্রুটাস এবং মীর জাফর পরিচিত হয়েছেন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে। সিরাজদ্দৌলা বিখ্যাত হয়েছেন শচীন সেনের নাটকে, যেটাতে সিরাজদ্দৌলা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। আর মধ্য-ষাটের দশকে নির্মিত 'সিরাজদ্দৌলা' চলচ্চিত্রে আনোয়ার হোসেন নাম-চরিত্রে কালজয়ী অভিনয় করেছিলেন। তবে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত *সিরাজদ্দৌলা* (১৮৯৮) গ্রন্থটি পলাশীর ঘটনাসহ তৎপূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইতিহাস জানার জন্য প্রামাণিক ধরা হয়। জুলিয়াস সিজারের জীবনাবলম্বনে রচিত শেক্সপিয়ারের *জুলিয়াস সিজার* নাটকটি নিঃসন্দেহে বলা যায় বিশ্বাসঘাতকতামূলক নাটকের উপর শেক্সপিয়ারের সেরা সৃষ্টি।

জুলিয়াস সিজার, সিরাজদ্দৌলা এবং বঙ্গবন্ধু এ তিনজনের হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্য, কেননা প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাষ্ট্রীয় সমাজে মৌল পরিবর্তন এসেছে নেতিবাচক অর্থে। জুলিয়াস সিজারের হত্যাকাণ্ডের পর রোমান রাজ্য রিপাবলিক থেকে সম্রাটশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। শুরু হয় রোমান সাম্রাজ্যবাদ। অর্থাৎ যে প্রজাতন্ত্রীর প্রতি হুমকি মনে করে জুলিয়াস সিজারকে ব্রুটাসের নেতৃত্বে খুন করা হয়, তাঁর মৃত্যুতে ফল হয় ঠিক উল্টোটা। প্রজাতন্ত্রী লোপ পেয়ে রোম হয়ে যায় সাম্রাজ্য এবং সিজারেরই ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টেভিয়াস সিজার হন রোমের প্রথম সম্রাট। ঠিক সেরকম বাংলার মসনদ পাবার লোভে রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে জোট বেঁধে মীর জাফর সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধের নানা বিবরণের মধ্যে একটি বয়ান হলো মীর জাফর এবং ইয়ার লতিফ খান তাঁদের সেনাদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় করে রাখে। ফলে সিরাজের পরাজয় হয়। সিরাজের পরাজয়ের পর মীর জাফর বাংলার মসনদে বসলেও রবার্ট ক্লাইভের পুতুল হয়ে রইলেন। বাংলার স্বাধীনতার সাথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও গেল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর খোন্দকার মোশতাক দুই মাস বাইশ দিন প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। ৭ নভেম্বর জিয়াউর রহমানকে ক্ষমতায়

বসান কর্নেল তাহের প্রমুখ। তারপর ২১টি বছর বাংলাদেশ প্রায় পাকিস্তানরূপে শাসিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি এসময় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেশ শাসন করে।

সিজার এবং সিরাজকে নিয়ে যেমন অবিস্মরণীয় সাহিত্য, নাটক ও চলচ্চিত্র হয়েছে, ঠিক সেরকম বঙ্গবন্ধুর মতো ট্র্যাজিক চরিত্র নিয়ে কেন সাহিত্য রচনা হবে না বা চলচ্চিত্র তৈরি হবে না? আমি অনুযোগ করছি না, কিন্তু এ লেখাটাতে বঙ্গবন্ধুর জীবনকে নিয়ে ট্র্যাজিক সাহিত্য বা চলচ্চিত্র নির্মাণের আকরের খোঁজ করার চেষ্টা করব।

আমার ধারণায় বঙ্গবন্ধুর ট্র্যাজিক জীবনকে সাহিত্যে বা সৃজনশীল মোড়কে আনতে গেলে কাহিনীটির প্রথম উপাদান হবে 'বিশ্বাসঘাতকতা'। খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জিয়াউর রহমান এবং 'মেজর চক্র'তো তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেনই, সাথে সাথে করেছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা। বিশ্বাসঘাতকতা ঘনিষ্ঠজনেরা করে থাকে এটা প্রমাণিত সত্য। একটু সাহিত্যের ছায়া নিয়ে বলি: শেক্সপিয়ারের অন্যতম ট্র্যাজিক চরিত্র ওথেলো তাঁর নিধনকারী ষড়যন্ত্রী ইয়াগোকে সবসময় সবচেয়ে বেশি বিশ্বস্ত মনে করতেন। বলতেন, 'অনেস্ট ইয়াগো' বা বিশ্বস্ত ইয়াগো। ঠিক সেরকম তেত্রিশজন সিনেটরের বত্রিশজন যখন সিজারকে একে একে ছোরা বিদ্ধ করতে লাগল, তখনও দুর্ধর্ষ সেনানায়ক সিজার তাঁর বৃদ্ধ শরীর দিয়ে আত্মরক্ষা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষতম ব্যক্তি হিসেবে যখন ব্রুটাস তাঁর ছোরা শানাতে শানাতে এগিয়ে এলেন, তখন বিস্মিত সিজার আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় ক্ষান্তি দেন। গ্রিক ইতিহাসবিদ প্লুটার্ক (পরে রোমান নাগরিক হন) লেখেন, 'এট্টু ব্রুটি'! অর্থাৎ তুমিও ব্রুটাস! এই বাক্যটি এতই অমোঘ যে, শেক্সপিয়ার তাঁর নাটকে এটির লাতিন থেকে ইংরেজি করলেন না, রেখে দিলেন, 'এট্টু ব্রুটি'। সিজার ব্রুটাসকে চিনতে না পারলেও সিরাজ কিন্তু মীর জাফরকে চিনেছিলেন। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের বইয়ে বহু প্রমাণের উপস্থিতি আছে যাতে বোঝা যায়, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে সিরাজ এবং মীর জাফরের মধ্যে ইঁদুর-বিড়াল খেলা অনেকদিন চলেছিল। কিন্তু মীর জাফরকে পরিচালনা করছিল সুচতুর ইংরেজ রবার্ট ক্লাইভ। প্রকারান্তরে, ক্লাইভের বুদ্ধির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সিরাজ পেরে উঠেন নি।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর সময়তো 'এট্টু মোশতাক' বলার সময় পাননি, সুযোগও পাননি। এদিক থেকে ভিলেইন হিসেবে মোশতাক ব্রুটাস এবং মীর জাফরের চেয়েতো সরেস ছিলেনই, এমনকি সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বললে তিনি শেক্সপিয়ারের সবচেয়ে চতুর ভিলেন ইয়াগোর চেয়েও সরেস ছিলেন। হ্যামলেট তাঁর চাচা এবং বর্তমান রাজা ক্লডিয়াসের ভিলেইনি নিয়ে বলছেন, 'ওয়ান মে স্মাইল এ্যান্ড স্মাইল এ্যান্ড বি আ ভিলেইন'। (একজন ভিলেইন হয়েও মুখে সবসময় হাসি বজায় রাখতে পারে।) সেরকম বঙ্গবন্ধু কোনদিনই জানলেন না খোন্দকার মোশতাক কত ধুরন্ধর ভিলেইন ছিলেন। কোথায় যেন পড়েছি, তাজউদ্দিন আহমেদ খেদ নিয়ে একদিন বলেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু কোনদিনই তাঁর কাছে মুক্তিযুদ্ধের সময় নয় মাস প্রবাসী সরকারের জীবন কেমন কেটেছিল সে কথা জানতে চাননি। ইতিহাসে বলি বা সাহিত্যে বলি, ট্র্যাজিক নায়কের চরিত্রে এ্যারিস্টোটল কথিত হামার্শিয়া বা দুর্বল দিক একটা থাকবেই, যে দুর্বলতার ফাঁক দিয়ে তার পতন হয়। অথচ ইতিহাস বলছে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসী সরকারের মন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আন্তর্জাতিকভাবে লবি করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের পরিবর্তে পাকিস্তানের সঙ্গে একটি লুজ ফেডারেশনের মাধ্যমে

সমঝোতায় আনার জন্য, যে-কারণে তাজউদ্দিন তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দেন। এর বহু আগে, ১৯৫৫ সালে শেখ মুজিবের উদ্যোগে দলের কাউন্সিল সভায় ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে 'মুসলিম' শব্দটি কেটে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' করা হয়, তখন আব্দুস সালাম খানসহ আর কিছু লোক নিয়ে খোন্দকার মোশতাক আহমদ দল ত্যাগ করেন। কাজেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে মোশতাকের ধর্ম নিয়ে এ দ্বন্দ্বটা প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু এ দ্বন্দ্বকে হত্যায় রূপান্তরিত করে খোন্দকার মোশতাক বাংলার ইতিহাসে সর্বনিকৃষ্ট ভিলেইনে পরিণত হন।

সাহিত্যের কাঁচামালের দিক থেকে মোশতাক ছিলেন যথার্থ ভিলেইন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটা গান আছে, 'মধু হই হই বিষ খাওয়াইলা'। ভিলেইনের চরিত্রও ঠিক তাই: বন্ধুত্বের ছলনায় হাসতে হাসতে সে বন্ধুর প্রাণ নেবে। এবং আশ্চর্য--কী অমোঘ অদৃষ্টের পরিহাস--বঙ্গবন্ধু এক জায়গায় মোশতাক সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাঁর (মোশতাকের) হাসির প্রশংসা করেছেন। এ উল্লেখটা আসছে তাঁর *কারাগারের রোজনামচা* (২০১৭) বইটাতে।

১৯৬৭ সালে বঙ্গবন্ধু জেলখানায়। ১৫ এপ্রিল পড়ল বাংলা নববর্ষ। বঙ্গবন্ধু লিখছেন: '২৬ সেল হাসপাতাল থেকে বন্ধু খোন্দকার মোশতাক আহমদও আমাকে ফুল পাঠাইয়াছিল'। 'বন্ধু খোন্দকার মোশতাক আহমদ'? এখন হয়তো আমরা চমকে উঠি, কিন্তু বাস্তবে এবং সাহিত্যে এভাবেই 'বন্ধু' শত্রুতে পরিণত হয়। আর ঠিক তার পরের রোজনামচা, ১৬ই এপ্রিল-২২শে এপ্রিল ১৯৬৭ উদ্দিষ্ট দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধু লিখছেন: 'খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও আবদুল মোমিন সাহেব হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। মোশতাক সাহেবের শরীর খুবই খারাপ, অনেক ওজন কম হয়ে গেছে। . . . মোশতাক সাহেবতো পুরানা পাপী। অত্যন্ত সহ্য শক্তি, আদর্শে অটল। এবার জেলে তাকে বেশি কষ্ট দিয়েছে। একবার পাবনা জেলে, একবার রাজশাহী জেলে আবার ঢাকা জেলে নিয়ে। কিন্তু সেই অতি পরিচিত হাসিমুখ'। (পৃ. ২২৪-২২৫)

সাহিত্যরচনাকারী ব্যক্তিমাত্রই জানেন, 'সেই অতি পরিচিত হাসিমুখ' বাক্যটি বঙ্গবন্ধুর অজান্তেই একটি চরম কূটাভাসী বাক্যালংকার হয়ে গেল। কারণ মোশতাক ছিলেন, ওয়ান মে স্মাইল এ্যান্ড স্মাইল এ্যান্ড বি আ ভিলেইন। বঙ্গবন্ধু নিজেও আরো একটা অমোঘ বক্রোক্তি করেছেন ঐ একই এন্ট্রিতে। বলছেন, 'মোশতাক সাহেবতো পুরানা পাপী'। ১৯৬৭ সালে বঙ্গবন্ধু এটা বন্ধুচ্ছলে ইতিবাচক অর্থে বলেছিলেন, কিন্তু মাত্র আট বছর পরে এটি দুর্দান্ত ট্র্যাজিক সত্যিতে পরিণত হয়।

বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মোশতাক দুই বছরের বড় ছিলেন। ছিলেন তাঁরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সতীর্থ। কিন্তু *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে (২০১২) মোশতাক কোন বিশিষ্টভাবে উল্লেখিত হন নি। পুরো বইয়ে প্রায় সাত আট জায়গায় অনেকের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে কেবল, কিন্তু মোশতাকের বিশেষ কোন ভূমিকার বর্ণনা নেই। ১৯৪৮/৪৯ সালে খাদ্য সমস্যা দেখা দিলে পাকিস্তান সরকার কর্ডন প্রথা চালু করে, যার অর্থ হলো এক জেলার ধান অন্য জেলায় যেতে দেওয়া হবে না। কিন্তু ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার দিনমজুর শ্রেণির লোক ধানের মৌসুমে ধান কাটতে খুলনা ও বরিশাল জেলায় ধান কাটতে যেত। হাজার হাজার নৌকা করে তারা যেত। ধান কাটার পর মালিকের অংশ মালিককে দিয়ে তাদের শ্রমের প্রাপ্য হিসেবে কাটা ধানের একটি অংশ

তারা বাড়িতে নিয়ে আসতো। এদেরকে বলা হতো দাওয়াল। কিন্তু কর্ডন প্রথা চালু হবার পর সরকার করল কি এ দাওয়ালদেরকে ধান কাটতে যাবার সময় নিষেধ করল না, কিন্তু ধান কেটে ফিরে যাবার সময় ধান রেখে দিল। ফলে দিন-মজুরগুলো চরম দারিদ্রে নিপতিত হলো। বঙ্গবন্ধু লিখছেন: 'এ খবর পেয়ে আমার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করলাম। সভা করলাম, সরকারি কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎও করলাম কিন্তু কোনো ফল হল না। এদিকে খোন্দকার মোশতাক আহমদ এই কর্ডনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা শুরু করেছে বলে আমি খবর পেলাম। অনেক সভা-সমিতি, অনেক প্রস্তাব করলাম কোনো ফল হল না। এই লোকগুলি দিনমজুর। দুই মাস পর্যন্ত যে শ্রম দিল, তার মজুরি তাদের মিলল না। আর মহাজনদের কাছ থেকে যে টাকা ধার করে এনেছিল এই দুই মাসের খরচের জন্য, খালি হাতে ফিরে যাওয়ার পরে দেনার দায়ে ভিটেবাড়িও ছাড়তে হল'। (পৃ. ১০৪)

দাওয়াল সমস্যা সংক্রান্ত মোশতাক সম্পর্কে এ ভূমিকার উল্লেখটুকু ছাড়া *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*-তে আর কোন বিস্তৃত উল্লেখ নেই। কিন্তু *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থে ১১ এপ্রিল ১৯৬৭ থেকে ২২ এপ্রিল ১৯৬৭ পর্যন্ত যে ক'দিনের রোজনামচা আছে, যার খানিকটা আগে উল্লেখ করেছি, তাতে মোশতাকের সবিশেষ উল্লেখ আছে।

১৩ এপ্রিল ১৯৬৪ সালে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে একটি মামলা শুরু হয় জেল গেটে। পল্টনে বক্তৃতা করার দায়ে ১২৪-এ ধারার রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা। এ সময়ে মোশতাকও পাবনা জেলে কারারুদ্ধ হন। পরে অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ঢাকা এনে জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বঙ্গবন্ধু লিখছেন: 'খোন্দকার মোশতাক জেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তার শরীর খুবই খারাপ। আমার জায়গা থেকে আমি দেখলাম মোশতাক হাসপাতালের বারান্দায় চেয়ারে বসে রয়েছে। চেনাই কষ্টকর। বেচারাকে কি কষ্টই না দিয়েছে! একবার পাবনা, একবার রাজশাহী একবার ঢাকা জেল'। (পৃ. ২২০)

বঙ্গবন্ধুর 'বন্ধু' মোশতাকের জন্য এ সমবেদনা আজকে আমরা গ্রহণ করতে পারছি না, কিন্তু সাহিত্যের ছকে এটি হলো যথার্থ উপকরণ: পরম বন্ধুর চরম বিশ্বাসঘাতকতা। এর সঙ্গে যদি ট্র্যাজিক নায়কেরা যে ভুলের কারণে নিজেদের পতন ত্বরান্বিত করেন, সে উপকরণটা সামনে নিয়ে আসি তা হলে বলা যায় জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে ট্র্যাজিক নায়কের দু'টো জিনিসের মধ্যে ভুল জিনিসটা বেছে নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম। ইতিহাসের গতিধারায় বঙ্গবন্ধুর জীবনেও এরকমের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল এবং সে সময়ে তিনি তাঁর সবচেয়ে বড় মিত্র তাজউদ্দিনকে গ্রহণ না করে ছদ্মবেশধারী মোশতাককে গ্রহণ করেছিলেন। এ বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তের জের এবং এর করুণ পরিণতি, যার জন্য বঙ্গবন্ধু সপরিবারেতো নিহত হলেনই, আরো নিহত হলেন জাতীয় চার নেতা নির্মমভাবে-যথাক্রমে সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, কামরুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং জাতির উপর অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে দিল। কিন্তু ঘটনাব্যুহের কেন্দ্রে থেকে ট্র্যাজিক নায়কের এটা বোঝার কথা নয়। কিন্তু এ না বোঝাটাই হচ্ছে সাহিত্যের আকর, অর্থাৎ প্লট তৈরি করার অন্যতম উপাদান।

বঙ্গবন্ধুর জন্য বিপদসীমার রেখাটা কিছুটা হয়তো অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধুর জামাতা এম এ ওয়াজেদ মিঞা। তাঁর বই, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ* (১৯৯৩) পড়লে বোঝা যায় খোন্দকার মোশতাকের কাছে তাঁর (ওয়াজেদের) সহজ প্রবেশাধিকার ছিল। বঙ্গবন্ধুকে মোশতাক যে-কথা সরাসরি বলতে পারতেন না, সে কথা অনেক সময় ওয়াজেদ মিঞাকে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর কানে পৌঁছাতে চেষ্টা করতেন।

১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি ওয়াজেদ মিঞার সঙ্গে মোশতাকের দেখা হয় ৩২ নম্বরে বাসার গেটে। খোন্দকার মোশতাক বলেন: 'বাবা ওয়াজেদ . . . আগামীকাল তোমার শ্বশুর (বঙ্গবন্ধু) সংবিধানের যে পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছেন, তা করা হলে সেটা শুধু একটি মারাত্মক ভুলই হবে না, এর ফলে দেশে এবং বিদেশে তাঁর ভাবমূর্তিও অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব এক্ষুণি বাড়ির তেতলার বৈঠকখানায় গিয়ে তোমার শ্বশুরকে এ বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করানোর চেষ্টা করো। আমি আমার শেষ চেষ্টা করে বিফল মনোরথে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বাসায় ফিরে যাচ্ছি'। (পৃ. ২৩৪)

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওয়াজেদ মিঞা সে রাতে বঙ্গবন্ধুকে মোশতাকের সতর্কবাণীর কথা পৌঁছাতে পারলেন না। ফলে তারপরের দিন, অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫-এ চতুর্থ সংশোধনী প্রায় বিনা বাক্যব্যয়ে সংসদে পাশ হয়ে গেলে বাংলাদেশে প্রেসিডেনশিয়াল শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়। এই যে ওয়াজেদ মিঞা বঙ্গবন্ধুর কাছে কোনক্রমেই মোশতাকের অনুরোধটা পৌঁছাতে পারলেন না, এটিও সাহিত্যের ছকে প্রয়োজনীয় এরর বা গুরুত্বপূর্ণ ভ্রান্তি হিসেবে বিবেচিত হবে, যা ঘটনার মোড় বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

চতুর্থ সংশোধনী পাশ হবার পর পারিবারিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর স্ত্রীর প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জুলিয়াস সিজারের স্ত্রী কালপুর্নিয়ার একটি প্রতিক্রিয়া বেশ খানিকটা মিলে যায়, আবার বেশ খানিকটা অমিলও থাকে।

মিলটা এখানে: যেদিন (১৫ মার্চ) সিজার সিনেটের সংসদীয় সভায় যাবেন, যেখানে তাঁকে হত্যা করা হবে, সেদিন সকালে কালপুর্নিয়া বলেন যে, তিনি যেন সংসদ ভবনে না যান, কারণ তিনি (কালপুর্নিয়া) বিগত রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন যে, রোমের রাস্তায় রাস্তায় মৃত মানুষ হাঁটছে আর বনের সিংহী এসে খোলা রাস্তায় বাচ্চা প্রসব করছে। সিজার স্ত্রীর কথা কুসংস্কার বলে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কাপুরুষেরা মৃত্যুর আগে বারবারই মরে, কিন্তু বীরেরা মাত্র একবারই মৃত্যুর স্বাদ পায়'। স্ত্রীর সাবধানবাণী না শুনলেও সিজার ঠিকই মারা পড়লেন।

ঠিক সেদিন (২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫) বঙ্গবন্ধু যখন বাসায় ফিরলেন বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা রণমূর্তি ধারণ করলেন। ওয়াজেদ মিঞা লিখছেন:

> বাসার দোতলায় উঠে দেখি যে, শাশুড়ি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে রেহানা ও রাসেলকে রূঢ়ভাবে বকাবকি করছেন। এক পর্যায়ে রেহানা ও রাসেলকে উদ্দেশ করে শাশুড়ি বলেন, 'তোদের আচার-আচরণ ও মেজাজ তো এখন এরকম হবেই। কারণ তোরা তো এখন পে-সিডেন্টের ছেলে-মেয়ে'। শাশুড়ি 'প্রেসিডেন্ট' শব্দটি ইচ্ছাকৃতভাবেই বিকৃত করে

উচ্চারণ করলেন বলে আমার মনে হলো। . . .

> সেদিন বঙ্গবন্ধু বাসায় ফেরেন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার দিকে। . . . বঙ্গবন্ধু হাতমুখ ধুয়ে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখার জন্যে তাঁর শয়নকক্ষের সামনের লবিতে এসে বসতে না বসতেই শাশুড়ি তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সংবিধানের এত ব্যাপক পরিবর্তন, বিশেষ করে একদলীয় (রাজনৈতিক) ব্যবস্থার প্রবর্তন করবে সে সম্পর্কে তুমি আমাকে একটু আভাস দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলে না। আর তোমার তক্ষুণি সংসদকক্ষেই দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেয়ার কি প্রয়োজন ছিল ? দু'চার দিন দেরী করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো ? যা হোক স্পষ্ট বলে রাখছি যে, আমি এই বাড়ি ছেড়ে তোমার সরকারী রাষ্ট্রপতি ভবনে যাচ্ছি না'। শাশুড়ির এই কথাগুলো বলার সময় বঙ্গবন্ধু মিটমিট করে হাসছিলেন। অতঃপর শাশুড়ির প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর না দিয়ে শুধু বললেন, 'আমি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তোমাকে সবকিছু বলতে পারি না'। (পৃ. ২৩৯-২৪০)

বঙ্গবন্ধুর জীবনী সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর নিজের এবং শেখ হাসিনাসহ অন্যদের লেখা পড়ে যতোটুকু জেনেছি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রেণুর সম্পর্ক ছিল নিরেট ভালোবাসায় পূর্ণ। বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক সব বিষয়ই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীর বিষয়টি স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেননি। করলে কী হতো না হতো সেটা আমাদের খোঁজ নয়, যেমন ওয়াজেদ মিঞা বঙ্গবন্ধুকে মোশতাকের উদ্বেগের কথা জানালে কী হতো সেটাও আমাদের খোঁজ নয়, কিন্তু এ প্রমাদটা, রেণুর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর চতুর্থ সংশোধনী নিয়ে আলাপ না হওয়া, এটাও সাহিত্যের ছক অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ট্র্যাজিক উপাদানের মধ্যে পড়ে।

আর কালপুর্নিয়ার সঙ্গে ফজিলাতুন্নেছার যেটা মেলেনি সেটা হলো তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, তিনি ছেলেমেয়ে নিয়ে সরকারি রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকবেন না।

থাকলেন না। বঙ্গবন্ধুও হয়তো সম্মতি দিলেন তাঁর কথায়। কিন্তু মাত্র সাত মাসের মাথায় প্রায় অরক্ষিত ৩২ নম্বর বাসভবনে তিনি মারা পড়লেন স্বামী, তিন পুত্র, দুই পুত্রবধূ ও একজন দেবর সহ।

বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকলে রক্ষা পেতেন কি পেতেন না, সেটাও এ লেখার খোঁজ নয়, বরঞ্চ এটা বলা হলো যে, এমন এক চরমক্ষণে স্ত্রীর একটি সিদ্ধান্ত ট্র্যাজিক নায়কের অবশ্যম্ভাবী গতিপথ তৈরি করল।

'যদি রাত পোহালে শোনা যেত বঙ্গবন্ধু মরে নাই'।

লেখক: ডিন, কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

বঙ্গবন্ধুর কারাজীবন

শেখ মুহম্মদ ইব্রাহীম

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো তাঁর কারাজীবন। বঙ্গবন্ধুর জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে কারাস্মৃতি। প্রকৃতপক্ষে কারাবরণ বঙ্গবন্ধুর জীবনে নতুন কোন ঘটনা ছিলো না। বাংলার মানুষের দাবি আদায় করতে গিয়ে, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে গিয়ে তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে। তাঁর জীবনের মূল্যবান এগারোটি বছর ওই কারাগারের চার দেয়ালের মধ্যে কাটিয়ে দিতে হয়েছে। তাঁকে অনেক সময় সইতে হয়েছে অমানুষিক অকথ্য নির্মম নির্যাতন। পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর কাছে তিনি ছিলেন প্রধান শত্রু। কারণ তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে এই অকুতোভয়, সাহসী সংগ্রামদীপ্ত নেতাকে দমন করতে না পারলে তাদের অত্যাচার, অবিচার, শাসন-শোষণের স্টিম রোলার চালাতে পারবে না। তাই পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর রোষাণলে পড়ে তিনি বারবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তাঁর কারাজীবনের বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে আলোচনা করা গেলো-যাতে বর্তমান প্রজন্ম কিছুটা আঁচ করতে পারে কিভাবে আমাদের মহান নেতাকে নির্যাতিত করা হয়েছে প্রতিটি পদে পদে।

শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম ১৯৩৯ সালের ১৭ মার্চ গ্রেপ্তার হয়ে সাতদিনের হাজতবাস করেন। তাঁর এ কারাবরণের কারণ হলো: অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে জীবনের প্রথম কারাবরণের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের শুভ-সূচনা ঘটে।

১৯৪৮ সালের ২ মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। মায়ের ভাষার প্রশ্ন নিয়ে মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ১১ মার্চ সচিবালয় গেটে শেখ মুজিব তাঁর কয়েকজন সহপাঠীসহ গ্রেপ্তার হন। তাঁদের গ্রেপ্তারে সারা বাংলার ছাত্রসমাজ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠলে ১৫ মার্চ গ্রেপ্তারকৃত ছাত্র নেতৃবৃন্দকে সরকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

১৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সাধারণ ছাত্রসভা হয়।

সভাশেষে ছাত্ররা মিছিল করে পরিষদ ভবন ঘেরাও করে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে। ১৭ মার্চ পুলিশী হামলার প্রতিবাদে শেখ মুজিবের আহবানে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। ১১ সেপ্টেম্বর বিশেষ ক্ষমতা আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছাত্র সমাজের প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তাঁকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে শরীক হন। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ায় তাঁকে অন্যায়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। এ বছরের এপ্রিলে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্যে অবস্থান ধর্মঘট করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেলে থাকাকালীন অবস্থায় ২৩ জুন তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুনের শেষের দিকে তিনি মুক্তিলাভ করেন। জেল থেকে বেরিয়েই দেশে বিরাজমান প্রকট খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার হন। কয়েকদিন পর জেল থেকে ছাড়া পেলেও অক্টোবরের শেষের দিকে লিয়াকত আলী খানের কাছে প্রতিবাদ করতে গিয়ে মাওলানা ভাসানীসহ পুনরায় গ্রেপ্তার হন।

১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ঢাকা আগমন উপলক্ষে ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়ে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবারে তাঁকে প্রায় দু'বছর জেলে আটক রাখা হয়। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে' ঘোষণা দিলে শেখ মুজিব জেলে থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ১৯৫২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি অনশন শুরু করেন এবং ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনশন অব্যাহত রাখেন। জেল থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানান ২১-এর মর্মান্তিক ঘটনার জন্যে। ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করে প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বনমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। ওই বছর ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা বাতিল করে দিয়ে ৩১ মে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে। ২৩ ডিসেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান কোয়ালিশন সরকারের শিক্ষা, বাণিজ্য ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর মার্শাল ল' জারি করা হয়। ১১ অক্টোবর শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৫ ডিসেম্বর মুক্তি দেয়। ১৯৫৯-এর ৩ জানুয়ারি পুনরায় শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয় দুর্নীতির অভিযোগে। দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৩০ মে তিনি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। এই বছর আগস্টে সামরিক সরকার ৬ বছরের জন্যে শেখ মুজিবের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে। ২২ আগস্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করে দু'বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই কারাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করে তিনি ৭ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিব গোপনে তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে দলীয় কর্মীদের প্রাণে সাহস সঞ্চার করেন। ১৯৬২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি জননিরাপত্তা আইনে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে ১৮ জুন ছেড়ে দেয়। এ বছরের অক্টোবরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যে কাজ করার জন্যে বিশিষ্ট ছাত্র নেতৃবৃন্দের দ্বারা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠন

প্রতিষ্ঠা করেন। আইয়ুব বিরোধী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৬৬ সালে বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়। এ বছর ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তি সনদ ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। ১ মার্চ তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ৬ দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্যে তিনি চারণের বেশে সারা বাংলায় চষে বেড়ান। এ বছরের প্রথম তিন মাস তাঁকে আটবার গ্রেপ্তার করা হয়। ছয় দফা দাবির জোরালো সংগ্রামের মুখে ভীত হয়ে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী অস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করে। শেখ মুজিব ও তাঁর অসংখ্য সহকর্মীদের গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেয়। এতে করে ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলন আরো প্রবল হয় এবং প্রতিটি বাঙালি তাদের প্রাণের দাবি হিসেবে ৬ দফাকে মেনে নেয়।

এতো জেল-জুলুমের পর শেখ মুজিবকে দমন করতে না পেরে, তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর জন্যে ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করা হয়। ১৭ জানুয়ারি শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেট থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকার কুর্মিটোলা সেনানিবাসে আটক করে রাখে। ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হয় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। এই অন্যায় ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে ফাঁসিতে ঝুলানোর ব্যবস্থা করে। কিন্তু তার ফল হয় পুরো উল্টো। এ মামলায় শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করায় বাংলার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। মিছিলে শ্লোগানে সারা বাংলা কেঁপে উঠে। প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে বাংলার আপামর জনসাধারণ। শ্লোগান উঠেঃ 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'।

ছাত্রদের নেতৃত্বে ১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারি ৬ দফা সম্বলিত ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্রদের নেতৃত্বে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন ক্রমে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এই অভ্যুত্থানের ভাষা ছিলো সরাসরি স্বাধীনতার পক্ষেঃ বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর। তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ। তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব। জয় বাংলা–এ ধরনের অসংখ্য শ্লোগান। এই আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার উন্মেষ হয়। সংঘটিত হয় ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। ২০ জানুয়ারি শহীদ হন ছাত্রনেতা আসাদ। তাঁর মৃত্যুতে আন্দোলন নতুনভাবে বাঁক নেয়, আরো তেজোদীপ্ত হয়। ২৪ জানুয়ারি কিশোর ছাত্র মতিয়ুরসহ আরো অনেকে শহীদ হন। মামলায় অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়। নিহত হন সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. শামসুজ্জোহা। এরূপ অন্যায়ভাবে হত্যা, জুলুম, নিপীড়নে বাংলার মানুষ আরো বারুদের মতো জ্বলে উঠে। প্রবল আন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার নতি স্বীকার করে ১ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠকের আহবান জানায় এবং শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দিতে রাজি হয়। শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্তি পেতে অস্বীকৃতি জানান। ২২ জানুয়ারি ছাত্র-জনতার প্রবল চাপের মুখে

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে প্রায় ১০ লাখ ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে এই বিশাল সমাবেশে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার নয়নমণি শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই মহাসমাবেশে তিনি ছাত্রদের ১১ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। জনতার প্রবল রোষে পড়ে আইয়ুব খান বিদায় নিলে ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হন। এ বছরের ৫ ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন: আজ থেকে আমাদের আবাসভূমির নাম 'বাংলাদেশ'।

১৯৭০-এর পাকিস্তানব্যাপী নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর মহান নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এতে পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর টনক নড়ে। তারা বাঙালিদের দমিয়ে রাখার জন্য নানা কূটকৌশল অবলম্বন করতে থাকে। ইয়াহিয়া-ভুট্টো এবং বাঙালি কিছু দালাল মিলে নানা ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে। বাংলার স্বাধিকারের আন্দোলন ক্রমে স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপ নিতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্রে ঘোষণা করেন: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

১৯৭১-এর মার্চ থেকে বাঙালির স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের হাতে বেশ কিছু বাঙালি নিধন হয়। ২৫ মার্চের কালো রাত্রিতে নিরীহ-নিরস্ত্র বাঙালির উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু মধ্যরাতের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে বাংলার সর্বস্তরের মানুষকে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পাকিস্তানি হানাদারদের রুখার আহবান জানান।

১৯৭১-এর ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে শেষ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং সর্বশেষ কারাবরণ। এই গ্রেপ্তার আগেরগুলোর চেয়ে ভিন্ন ধরনের ভিন্নমাত্রার। তাঁর এই গ্রেপ্তারকে নিয়ে নানাজনে নানা কথা বলে থাকে। নানা ধরনের রং লাগাবার চেষ্টা করে। তবে এটা সত্য, বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসবিদরা এই গ্রেপ্তারের মূল রহস্য উদঘাটন করে জাতির সামনে চিরসত্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ করবেন। এই সময়ের প্রেক্ষাপট পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু বাধ্য হয়েছিলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করতে। তাঁর সহকর্মীদের মতো তিনিও পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা' করেননি নানা কারণে। যা' আমরা পরে তাঁর মুখ থেকে শুনেছি এবং যার সমর্থন অকপটে করে গেছেন বিদেশি সাংবাদিক ও লেখকরা। পাকিস্তানি শত্রুবাহিনী তাঁকে হাতের কাছে না পেলে আরো বেশি নিধনযজ্ঞ চালাতো। ভারতে গেলে অনেকেই মনে করতো তিনি পূর্বে যোগসাজশ করে এসব করেছেন। বাঙালির মূল নেতৃত্ব হাতের নাগালের মধ্যে পেয়ে পাকিস্তানিরা ভেবেছিলো তাদের স্বপ্নের পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারবে। তারা বুঝতে পারেনি মুক্ত মুজিবের চেয়ে বন্দী মুজিব অনেক শক্তিশালী।

২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর এর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় একটি কামরায় রাখে। পরদিন বিমানযোগে পাঠিয়ে দেয় করাচী। করাচীতে একদিন রাখার পর স্থানান্তর করা হয় মিয়ানওয়ালী কারাগারে। সংকীর্ণ, নির্জন, অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোট্ট একটি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের সেলে রাখা হয়। সেলের ভাঙা একটি খাটে তেল চিটচিটে চাদর ও

বালিশ দেওয়া হয় তাঁকে শোবার জন্যে। শীতকালে দেওয়া হলো দুর্গন্ধময় পাতলা একটি কম্বল। একটি মাত্র মগ দেওয়া হলো যা দিয়ে পানি পান করা, গোসল করা ও শৌচকর্ম সারতে হতো। একজোড়া জীর্ণশীর্ণ পরিত্যক্ত সেন্ডেল দেওয়া হলো। এসব জিনিস ছাড়া সেলের মধ্যে আর কিছু ছিল না। বাইরের পৃথিবী থেকে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। ছিলো না কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা। দীর্ঘ নয় মাস ধরে এরূপ দুর্বিসহ জঘন্য কারার অন্তরালে তাঁকে কালাতিপাত করতে হয়। এক প্রকার নীরবে-নিভৃতে অসহনীয় অবস্থায় কেটেছে তাঁর এই কারাজীবন। বঙ্গবন্ধুকে এই কারাগারে রাখার ব্যাপারে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি গোপনীয়তা রক্ষা করে।

বঙ্গবন্ধুর এ সেলে আলো বাতাস ঢোকার পথ ছিলো না। ছিলো না কোন পাখার ব্যবস্থা। এক ধরনের স্যাঁতস্যাঁতে ভ্যাপসা আবহাওয়া সবসময় বিরাজ করতো ওই সেলে। শুয়ে, বসে, ঘুমিয়ে বঙ্গবন্ধু ওই সেলে সময় কাটাতেন। সেলের সামনে এক চিলতে জায়গা ছিলো–যা' কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে এই জায়গায় পায়চারী করে সেলের একঘেয়েমি থেকে কিছুটা মুক্তি পেতেন। সময়ের পরিক্রমায় এমনি করে চলে আসে জুলাই মাস।

কারাগারের অযত্ন, মানসিক চাপ, নিঃসঙ্গতা-সর্বোপরি অনিশ্চয়তা ইতোমধ্যে শেখ মুজিবকে অত্যন্ত পীড়িত করে তুলে। এভাবে তিনি ক্রমশ নিঃশেষ হতে লাগলেন। এর মধ্যেই হঠাৎ করে জেলের কর্মকর্তা হাবিব খান বঙ্গবন্ধুর খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেন। সেলে ফ্যানের ব্যবস্থা, খাবার মেনুতে কিছুটা উন্নতি হলো। পর্বতঘেরা মিয়ানওয়ালীর কারাগারের সেল বরফাচ্ছাদিত হলো। কিছুতেই মানছিলো না শীত। পাতলা কম্বলটায় শীতে তিনি কোঁকাচ্ছিলেন। তাঁর দুর্গতি দেখে জেলের এক প্রহরী একটি কম্বল এনে দেন। প্রহরীর সহানুভূতি দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন।

এদিকে সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। ইয়াহিয়া খান নানা ষড়যন্ত্রের জাল বুনছিলো বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাতে। বিচারের নামে সাজানো নাটকের স্থান হলো লায়ালপুর কোর্ট। কোর্টে তিনি সাহসিকতার সাথে উচ্চারণ করেছিলেন: 'বিচারে আমাকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তবে আমার লাশ যেন মাতৃভূমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়'। ইয়াহিয়ার বিচারের নামে প্রহসনের বিরুদ্ধে বাধ সাধলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। ভুট্টো বুঝতে পারলেন শেখ মুজিবকে হত্যা করলে সারা বিশ্বব্যাপী যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তা সামলানো খুবই মুশকিল হবে।

দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কাটতে থাকে বঙ্গবন্ধুর বন্দী জীবনের সময়। ডিসেম্বরের প্রথম থেকেই তাঁর কারাগার জীবন আরো কড়াকড়ি করা হয়। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খান সম্মতি দিয়েছেন এ খবর বঙ্গবন্ধুর কানে গেলো। তখন থেকে সেলে বসে তিনি মৃত্যুর ক্ষণ গুণতে লাগলেন।

দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রাম, পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন-এসব কিছু জানতেন না বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে। বাইশে ডিসেম্বর দুপুর বেলা বঙ্গবন্ধু জানালার ভাঙা কাঁচ দিয়ে দেখলেন একটি গর্ত খোঁড়া হচ্ছে এক চিলতে ওই ফাঁকা জায়গাটায়। তিনি বুঝতে পারলেন ওই গর্তেই তাঁকে কবর দেওয়া হবে। তাঁর প্রহরার নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো কড়া করা হলো। তাঁকে মারার জন্যে এতসব আয়োজন তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন। মৃত্যুর মুখোমুখি এমনি সময়ে ছাব্বিশে ডিসেম্বর রাতে একটি ট্রাক এসে দাঁড়ালো জেলখানার সামনে। ট্রাক থেকে চারজন সৈন্যসহ জেল কর্মকর্তা হাবিব খান নেমে এলেন। বঙ্গবন্ধুর সেলে গিয়ে তাঁকে বাইরে নিয়ে

এসে বললেন: 'আপনি এখন মুক্ত। আপনার নিরাপত্তার জন্যে আমার বাসায় নিয়ে যাচ্ছি'। বঙ্গবন্ধুকে ট্রাকে তুলে হাবিব খান বাসায় নিয়ে এলেন। তাঁর থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা হলো অনেকদিন পর। তবে তাঁর চলাচল সীমিত করা হলো।

১৯৭২-এর ১ জানুয়ারি বিকেল চারটায় বঙ্গবন্ধুকে একটি স্টাফ কারে করে হাবিব খানের বাসা থেকে নিয়ে যাওয়া হলো রাওয়ালপিন্ডি থেকে পঁচিশ মাইল দূরে শাহউল্লাহ নামক স্থানের একটি বাংলোয়। এসময় ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে ভুট্টো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট রূপে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। এ বাংলোতে ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলেন এবং প্রস্তাব করলেন পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশকে কনফেডারেশন করার জন্য। বঙ্গবন্ধু এ প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। এর মধ্যে সারা পৃথিবীব্যাপী বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারে জনমত সোচ্চার হলো। বিভিন্ন পরাশক্তিগুলো ভুট্টোর উপর চাপ প্রয়োগ করলেন বাঙালির নেতাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে। অবশেষে ভুট্টো নতি স্বীকার করে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। পাকিস্তান থেকে সরাসরি বাংলাদেশে আসার কোন ব্যবস্থা না থাকায় বঙ্গবন্ধু লন্ডন হয়ে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। পি.আই-এর একটি বিমানে করে তাঁর লন্ডন যাওয়ার ব্যবস্থা হলো। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ভুট্টো এসে তাঁকে বিমান বন্দরে বিদায় জানালেন। প্লেন আকাশে উড়ার সাথে সাথে ভুট্টোর মনে হলো পাকিস্তানের অর্ধেক যেন চিরতরে আকাশে মিলিয়ে গেলো।

৯ জানুয়ারি বিমানটি হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করলে অসংখ্য মানুষ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। দীর্ঘ নয়মাস ধরে পুরো বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ ও অত্যাচারের কথা শুনে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। সন্ধ্যায় ১০নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ৯ জানুয়ারি রাতে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি বিমানে করে তিনি প্রিয় মাতৃভূমির দিকে রওয়ানা হন। মধ্যখানে দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে যাত্রা বিরতির সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। ১০ জানুয়ারি দুপুর ১-৪০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ব্রিটিশ বিমান বাংলাদেশের ভূমি স্পর্শ করে। বিমান বন্দরে অসংখ্য মানুষের ভীড়। সেদিন রাজধানী ঢাকায় নেমেছিলো মানুষের ঢল। সবাই তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে একনজর দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো-যাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য বাংলার মানুষ গভীর উৎকণ্ঠায় ছিলো। অবশেষে দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে তাদের সেই উৎকণ্ঠার অবসান হলো।

বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাধিকবার জেল খেটেছেন। জেলখানাকে তিনি চিহ্নিত করতেন তাঁর 'দ্বিতীয় বাড়ি' হিসেবে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁর জন্যে একটি নির্দিষ্ট কক্ষ ছিলো যার নাম 'দেওয়ানী'। এই কক্ষটি এখনো তাঁর স্মৃতিচিহ্ন বয়ে নিয়ে আছে। কক্ষের বাইরে বঙ্গবন্ধু ফুলের চারা ও গাছ রোপণ করেছিলেন। রাজনৈতিক কারণে দিনের পর দিন ওখানেই তাঁকে থাকতে হয়েছে। মূলত রাজনীতি আর জেল বঙ্গবন্ধুর জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের অধিকার আদায় এবং দেশকে স্বাধীন করার জন্যে তাঁকে বিশ্বের অন্যান্য নির্যাতিত নেতাদের মতো বারে বারে কারাবরণ করতে হয়েছে। এই কারাজীবনই তাঁকে বারে বারে রাজনৈতিকভাবে পুনর্জন্ম দিয়েছে। এভাবে তিনি হয়ে উঠেছেন বাংলার অবিসংবাদিত মহান নেতা।

লেখক: পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

জননায়ক বঙ্গবন্ধু

সাদাত জামান খান

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট যখন মারা যান, শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য তাঁর শবদেহ আমেরিকার এক দূরবর্তী শহর থেকে অন্য একটি শহরে যখন রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন লক্ষ লক্ষ জনতা শহরের রাস্তাগুলোকে জনাকীর্ণ করে রেখেছিল। রাস্তার ধারে দাঁড়ানো এক সাধারণ লোককে পৃথক করে এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করছিল: 'আপনি কি রুজভেল্টকে চেনেন'? লোকটি বলে উঠল: 'আমি তাঁকে তেমন চিনি না, তবে তিনি আমাকে চিনেন'। এইজন্য আমেরিকার রাজনীতিতে একটি কথা প্রচলিত 'You have to put your feet is to people's shoe' অর্থাৎ সাধারণ জনতার জুতা পায়ে দিয়েই তাদেরকে বুঝতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যা তাঁকে সত্যিকার অর্থে জনতার মানুষ বানিয়েছিল, তা হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজে নেওয়া। বঙ্গবন্ধু তাঁর হৃদয়ছোঁয়া ভাষণের প্রারম্ভে বলেছিলেন 'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি'। মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর এই উদার ভালোবাসা ও নিজেকে তাদের কাতারে সামিল করার যে প্রয়াস, তা তাঁকে জননায়কে পরিণত করেছে। সব রাষ্ট্রনায়কেরা জননায়ক হতে পারেনি, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর স্থান ছিল সাধারণ মানুষের মনের মণিকোঠায়। প্রান্তিক জনপদের মানুষের মধ্যেও তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসা একটি সাধারণ জনশ্রুতি হয়ে গিয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'My Truth'-এ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁকে 'Father figure' বা পিতৃসুলভ ব্যক্তি হিসেবে প্রশংসা করেন। ইন্দিরা গান্ধি আরও লিখেন: 'বাংলার সর্বস্তরের জনতা আজ যা করছে তা তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) নামে এ ত্যাগ-তিতিক্ষা করছে'। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি ছিল ইন্দিরা গান্ধির অবিচল আস্থা।

সাধারণ জনতার প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। তাঁর মহত্ত্ব ও অনুপ্রেরণা প্রতিটি স্বাধীনতাকামী মানুষের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। যার ফলে বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষকে জীবনবাজি রেখে স্বাধীনতার জন্য আত্মনিবেদন করতে ব্যাপকভাবে প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন। এ প্রস্তুতির

এক মাহেন্দ্রক্ষণ ৭ মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উপনীত হয় বাঙালির নতুন জাতিসত্তা।

আব্রাহাম লিংকনের দেওয়া সেই বিখ্যাত ভাষণে (যাকে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়) বলা হয়েছিল: 'The world will little note, what we say here, but it will never forget what they did here.' এ উক্তিটি বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ক্ষেত্রে বরাবরই প্রাসঙ্গিক। আব্রাহাম লিংকন হয়তো বোঝাতে চেয়েছিলেন যা আমরা আজ বলছি তা পৃথিবী মনে রাখেবে না কিন্তু যা তোমরা করলে পৃথিবী এটা কখনও ভুলে যাবে না। কিন্তু সত্যি হলো আমেরিকার গৃহযুদ্ধের স্মৃতি ছাপিয়ে তাঁর অপূর্ব ভাষণটি ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে গ্রন্থিত হলো। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিও একইভাবে মানুষের মুক্তির আন্দোলনের, স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে একটি জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাসকে ছাপিয়ে বরেণ্য হয়ে উঠল পৃথিবীর ইতিহাসে।

এ ভাষণটির আরও একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হলো–এটি একটি অলিখিত বক্তব্য। বঙ্গবন্ধুর প্রত্যুৎপন্নমতি ভাবাবেগ থেকে নিঃসৃত শব্দমালা ও আবেগের সমন্বয়ে এই বক্তব্য এক অপূর্ব দ্যুতি তৈরি করেছিল। আবুল মোমেন বলেন: 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশের ইতিহাসে অনির্বাণ শিখার মতো'। তিনি আরও বলেন: 'ভাষণটি কেবল বুদ্ধির নির্মাণ নয়। ভালোবাসার আবেগে জীবন্ত। এটির আবেদন যুগপৎ বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির কাছে। তাই অনুপ্রাণিত এক বক্তা সেদিন তাঁর মুখাপেক্ষী জনতাকে জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রত সাধনের আহ্বান করছিলেন।...এমন মর্মভেদী, অন্তর স্পর্শী ও দূরদর্শী বক্তৃতার দৃষ্টান্ত মেলে না ইতিহাসে'।

জওহরলাল নেহেরু 'স্বাধীনতা ও এর প্রতিষ্ঠা' সূচক বক্তৃতায় ইন্ডিয়ার জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতার সুরে বলেছিলেন: 'ইন্ডিয়ার বন্দীত্ব এবং শৃঙ্খল থেকে মানবতার মুক্তি ঘটাতে তোমরা কাজ করেছ'। বঙ্গবন্ধুর ভাষণটিও বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের উপর মুক্তিকামী জনগণের আবেগের প্রতিফলন ঘটিয়েছে, যা কালের বিবর্তনে হারায়নি, বরং কালজয়ী হয়েছে এবং স্থান ও কালের উর্ধ্বে উঠে শৃঙ্খলিত মানবতার মুক্তির সঙ্গীত হিসেবে বেজে উঠেছে। রুজভেল্ট প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলাম লেখাটি, কারণ সাধারণ মানুষকে চিনতে পারা ও তাদের মনস্তত্ত্বের সাথে একীভূত হতে পারার এ গুণটি একটি অসাধারণ গুণ। কথিত আছে বঙ্গবন্ধু কক্সবাজার অঞ্চলের ফলের আড়তদার সৈয়দ আমির আহমেদ নাম ধরে ডেকে হাজার জনতার ভেতরে তাঁকে মুগ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন দু'বার। তাই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর শোকে এতটাই মুহ্যমান হয়ে গিয়েছিলেন যে অল্প ক'দিনের মধ্যে মানসিক কষ্ট ও বিয়োগব্যথায় নিজেও রইলেন না বেশিদিন। এমন দৃষ্টান্ত বহু।

এই হলো বঙ্গবন্ধুর সাধারণ মানুষের মাঝে স্থান করে নেওয়া। মনের অন্তরালে ঢুকে আপন করে নেওয়ার অদ্ভুত মানবিক ক্ষমতা তাঁকে জননায়ক করেছিল এবং বিশ্বনন্দিত অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করেছিল। তাঁর প্রতিটি অক্ষর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে নিঃসৃত, রক্তপ্রবাহের সাথে অনুরণিত। তিনি আমাদেরকে, এ বাঙালি জাতিসত্তাকে চিনেন। আর চিনেন বলেই এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম হয়েছে, হয়েছে 'মুক্তির সংগ্রাম'।

লেখক: চেয়ারম্যান, ইংরেজি বিভাগ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

কেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলেন জাতির পিতা?

সঞ্জয় বিশ্বাস

শেক্সপিয়ার বলেছিলেন এ জগৎসংসারে 'কেউ কেউ জন্মগতভাবেই মহান, কেউ কেউ স্বীয় প্রচেষ্টায় মহানুভবতা অর্জন করেন, আবার কেউ মহত্ত্বের লক্ষণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন'। আমি বিশ্বাস করি, শেক্সপিয়ার থেকে উদ্ধৃত মহত্ত্বের ৩টি বৈশিষ্ট্যই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য। ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট ১৯৭২ সালে এক সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: 'আপনার শক্তি কোথায়'? বঙ্গবন্ধু জবাব দিয়েছিলেন: 'আমি আমার জনগণকে ভালোবাসি'। আর যখন জিজ্ঞেস করা হল: 'আপনার দুর্বল দিকটি কী'? বঙ্গবন্ধুর উত্তর: 'আমি আমার জনগণকে খুব বেশি ভালোবাসি'। এই-ই হলেন বঙ্গবন্ধু। জনগণের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর অপার আস্থা-বিশ্বাস, মানুষের প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসা, মমত্ববোধ, সহমর্মিতাসহ দেশপ্রেমের বিরল দৃষ্টান্তসমৃদ্ধ সাহসী মানুষ–বঙ্গবন্ধু।

জনগণের অন্তর্নিহিত অপার শক্তি ও অসীম ক্ষমতার উপর বিশ্বাস; জনগণ এবং কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে–এই-ই ছিলো বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-দর্শনের মূলভিত্তি–যা ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে স্পষ্ট। বিশেষ করে দরিদ্র মেহনতি মানুষের স্বার্থ ছিলো তাঁর কাছে সবকিছুর ঊর্ধ্বে। আর সে কারণেই দেশপ্রেমের যত রূপ আছে, মানুষের প্রতি ভালোবাসার যত রূপ আছে, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও সহমর্মিতার যত রূপ আছে, জনগণের প্রতি অগাধ আস্থার যত ধরন আছে, মহানুভবতার যত রূপ আছে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার যত সংগ্রামী রূপ আছে সবই যে-একক ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল–তিনিই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। এসবই বঙ্গবন্ধুর বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি। এসবই বঙ্গবন্ধুকে করেছে 'দেশজ উন্নয়ন দর্শনের (Home grown development philosophy) উদ্ভাবক, স্রষ্টা ও বিনির্মাতা'।

মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জিত হল। কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন? গড়তে চেয়েছিলেন কোন্ বাংলাদেশ? বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন তাঁরই উদ্ভাবিত দেশের মাটি থেকে উত্থিত অথবা

স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে এমন এক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে যে-বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যে-বাংলাদেশে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি হবে চিরস্থায়ী, যে-বাংলাদেশ হবে চিরতরে ক্ষুধামুক্ত-শোষণমুক্ত, যে-বাংলাদেশে মানবমুক্তি নিশ্চিত হবে, যে-বাংলাদেশে নিশ্চিত হবে মানুষের সুযোগের সমতা, যে-বাংলাদেশ হবে বঞ্চনামুক্ত-শোষণহীন-বৈষম্যহীন-সমতাভিত্তিক-অসাম্প্রদায়িক দেশ; যে-বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ, যে-বাংলাদেশে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে; যে-বাংলাদেশ হবে সুস্থ-সবল-জ্ঞানচেতনা সমৃদ্ধ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আলোকিত মানুষের দেশ।

কেমন বাংলাদেশ চাই প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বেতার ও টিভি ভাষণে বঙ্গবন্ধু বললেন: 'আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজবিপ্লবে বিশ্বাস করে। এটা কোন অগণতান্ত্রিক কথামাত্র নয়।...একটি নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনার জন্য পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়বো'। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-প্রগতি দর্শন গণমানুষের স্বার্থ-কল্যাণ-সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামেরই ফসল। বঙ্গবন্ধুর প্রগতি দর্শনের অন্যতম সুস্পষ্ট প্রতিফলন হয়েছে ১৯৭২-এর সংবিধানের প্রস্তাবনায়–যেখানে বলা হয়েছে 'আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা–যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে'। বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে আর সংবিধান রচিত হয়ে গেল ০৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র ১০ মাসের মধ্যেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন হয়ে গেল। ইতিহাসে এ-ও এক বিরল দৃষ্টান্ত যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশে এত কম সময়ের মধ্যেই সংবিধান প্রণয়ন হয়ে গেল। তাও আবার যেনতেন সংবিধান নয়। জনগণের শক্তির প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপার আস্থা-বিশ্বাস নির্ভর দেশজ উন্নয়ন নিশ্চিত করার দর্শনগত ভিত্তির সংবিধান।

শোষণ-বঞ্চনা-বৈষম্য-অসমতা নিরসনসহ অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মুক্তি ও বিকাশ উদ্দিষ্ট চার স্তম্ভভিত্তিক (সংবিধানের মূলনীতি) বিরল এক সংবিধান। স্তম্ভ চারটি হলো: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা কেমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলাম তা স্বল্প কথায় বোঝাবার জন্য সংবিধানের প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ এবং ১০ নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। মানুষের উপর মানুষের শোষণ হতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 'সোনার বাংলা' গড়ার অন্যতম প্রধান মানদণ্ড হিসেবে দেখে গিয়েছেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর এ মহালগ্নে তাঁর দেশজ উন্নয়ন দর্শনের ভিত্তিতে শোষণহীন বঞ্চনামুক্ত ও মৌলিক মানবাধিকার-এর নিশ্চয়তা সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয়ে আরও একবার আমরা দৃপ্তকণ্ঠে শপথ নিই। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণের উদ্যোগে আমরা যূথবদ্ধভাবে যুক্ত হই।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

শেখ মুজিবুর রহমান: তাঁর প্রিয় গায়ক এবং গান

রুমানা চৌধুরী

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। প্রাচীন বাঙালি সভ্যতার আধুনিক স্থপতি হিসেবে তাঁকে বলা হয়ে থাকে জাতির পিতা বা জাতির জনক। রাজনীতি ছাড়াও অন্যান্য যেসব বিষয়ের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আগ্রহ ছিল, তার মধ্যে অন্যতম হল সঙ্গীত। তাঁর রচিত 'কারাগারের রোজনামচা' এবং 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইগুলোতে তিনি গানের প্রতি ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া তাঁর পরিচিত মানুষজনদের বাক্যালাপ থেকেও এ ব্যাপারে জানা যায়। বিভিন্ন ধরনের গান শোনার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের অসম্ভব আগ্রহ ছিল। রবীন্দ্র, নজরুল, দেশের এবং বাউল আঙ্গিকের গান শুনতে বঙ্গবন্ধু খুব ভালোবাসতেন। বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা এবং ভাটিয়ালী গানের শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের সাথে তাঁর ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ মধুর সম্পর্ক। খুব মনোযোগের সাথে তিনি আব্বাস উদ্দীনের সব গান শুনতেন। আব্বাস উদ্দীনের গান সম্পর্কে শেখ মুজিব তাঁর আত্মজীবনীমূলক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন: 'নদীর তীরে বসে আব্বাস উদ্দীনের গান না শুনলে জীবনটা অর্থহীন মনে হয়। তাঁর গানের সুরে যেন নদীর কুলুকুলু শব্দ ভেসে আসে'। শেখ মুজিবের আরেক প্রিয় এবং স্নেহধন্য সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন আবদুল জব্বার, যাঁকে তিনি আদর করে ডাকতেন 'পাগলা' বলে। জাতির পিতা আর বঙ্গমাতাকে আবদুল জব্বার সম্বোধন করতেন 'বাবা' ও 'মা'। আবদুল জব্বারের গাওয়া 'সালাম সালাম হাজার সালাম, সকল শহীদ স্মরণে' শুনে শেখ মুজিব এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি আবদুল জব্বারকে মন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আবদুল জব্বার শেখ মুজিবকে নিরুৎসাহিত করলেন। এরপর শেখ মুজিব আবদুল জব্বারকে বেতারের সর্বোচ্চ পদে আসীন করতে চাইলেন, কিন্তু আবদুল জব্বার সেই পদও ফিরিয়ে দিলেন। আবদুল জব্বার শুধু গান নিয়ে কাজ করার আগ্রহ দেখালে শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তীতে তাঁকে সবরকম সহযোগিতা করেন। বাউল গানের শিল্পী শাহ আবদুল করিম বয়াতিকে জাতির পিতা ডাকতেন 'আমার করিম ভাই' বলে। বঙ্গবন্ধুর সাথে খোলা মঞ্চে তাঁর ভাষণের পাশাপাশি শাহ আবদুল করিম অসংখ্যবার গান পরিবেশন করেন। ১৯৬৯ সালে

সুনামগঞ্জের জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরপরই শাহ আবদুল করিম বয়াতি তাঁর গান গাইতে শুরু করলেন। সেদিন তাঁর গান শুনে বঙ্গবন্ধু এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, গান শেষে তিনি ঘোষণা দিলেন: 'বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে করিম ভাইও বাঁচবে। করিম ভাই যেখানে, শেখ মুজিব সেখানে'।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আর গানের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের বরাবরই বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি সবসময়ই রবি ঠাকুরের দেশের গান শুনতে ভালোবাসতেন। তাঁর প্রিয় গান ছিল 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি', যা পরবর্তীতে তাঁর নির্দেশে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ঘোষিত হয়। জেলে এগারো বছর থাকাকালীন জাতির পিতার সার্বক্ষণিক সাথী ছিল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার বই 'সঞ্চয়িতা'। যখনই তিনি একা অথবা অসহায়বোধ করতেন, 'সঞ্চয়িতা' নিয়ে বসতেন, কবিতাগুলো পড়ে মানসিক শক্তি পেতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা' বঙ্গবন্ধুর পছন্দের গান। এছাড়া বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের উদ্দীপনামূলক গান বঙ্গবন্ধুকে অনেক আকৃষ্ট করত। নজরুলের 'চল চল চল, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল' শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশের রণসঙ্গীত হিসেবে পরিচিতি পায়। দেশের গান শুনবার সময় শেখ মুজিব খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন। বেঁচে থাকাকালীন কবি এবং শিল্পীদের তিনি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেন। তাঁর যোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই ধারাবাহিকতা যথাযথভাবে ধরে রেখেছেন। দেশে বিদেশে তাইতো বাংলা ভাষা আর বাংলা গান বিশেষ স্থান দখল করেছে। সালাম, আমাদের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

বঙ্গবন্ধু ও নিউক্লিয়াস

মিনহাজ হোসাইন

অনেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলতে গিয়ে ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক তোলে। অথচ দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তার নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি '৬১ সাল থেকেই গোপন সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে ১৯৬১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বৈঠক করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির মণি সিংহ আর খোকা রায়ের সঙ্গে। আওয়ামী লীগের পক্ষে আলোচনায় ছিলেন মানিক মিয়া ও শেখ মুজিব। খোকা রায় লিখেছেন: 'আন্দোলনের দাবি নিয়ে আলোচনার সময় শেখ মুজিবুর রহমান বারবার বলেছিলেন যে পাঞ্জাবের *বিগ বিজনেস* যেভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করছিল ও দাবিয়ে রাখছিল তাতে ওদের সঙ্গে আমাদের থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে; আন্দোলনের প্রোগ্রামে ঐ দাবি রাখতে হবে ইত্যাদি'।

মণি সিংহ ও খোকা রায় বোঝালেন যে, সে পরিস্থিতি এখনো আসেনি। যখন আসবে তখন দেখা যাবে। মুজিব বললেন: 'ভাই এবার আপনাদের কথা মেনে নিলাম। আমাদের নেতাও অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী সাহেব আপনাদের বক্তব্য সমর্থন করেন। তাই এখনকার মতো সেটা মেনে নিয়েছি। কিন্তু আমার কথাটা থাকল'। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬১ সাল থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

১৯৬২ (কোথাও উল্লেখ আছে '৬১) সালে নিউক্লিয়াসের তিনজন হাইকমান্ড যথাক্রমে সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ গঠন করেন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ। আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুকে নিউক্লিয়াসের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার দায়িত্বভার অর্পিত হয় জনাব আব্দুর রাজ্জাকের উপর। নিউক্লিয়াসের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হতো খুবই গোপন বৈঠকের মাধ্যমে। কাজেই পরিকল্পনা মাফিক নিউক্লিয়াসের কার্যক্রম সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া ছিল

কল্পনাতীত বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল। পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে ছাত্রলীগ নেতা আবুল কালাম আজাদ ও ১৯৬৫ সালে চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ নেতা জনাব এম এ মান্নানকে নিউক্লিয়াসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রধানত ছাত্রলীগ থেকেই এই সংগঠনের সদস্যদের সংগ্রহ করা হতো, ছাত্রলীগের নিবেদিত বিপ্লবী কর্মীরাই ছিল এই সংগঠনের ভরসা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সংকল্পে নিউক্লিয়াস তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে এবং তাঁরই উপদেশে পরবর্তীতে শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদকে নিউক্লিয়াসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের নিউক্লিয়াসের প্রতি সহানুভূতি ছিল। অ্যাডভোকেট কমরুদ্দিন আহমেদ, ডক্টর আহমেদ শরীফ, প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক ও প্রফেসর নূর মোহাম্মদ মিয়া, বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী মরহুম বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এই সংগঠনের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন ।

'৬৯ সালে প্যারোলে মুক্তির কঠিন সিদ্ধান্তটি শেখ ফজিলাতুন্নেছার দৃঢ়তার জন্যই ফলপ্রসূ হয়নি। এছাড়াও '৭১ সালে মুজিব-ভুট্টো, মুজিব-ইয়াহিয়ার আলোচনার সময় বেগম মুজিবের দৃঢ় ও আপোষহীন ভূমিকার কথা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। অপরদিকে ছাত্রলীগকে গতিশীল ও সুশৃঙ্খল সংগঠনরূপে গড়ে তুলতে নিউক্লিয়াস দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায় ১৯৬৪ সাল থেকে। এভাবেই ১৯৬৮ সাল নাগাদ গোটা বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপ্লবী পরিষদ বা নিউক্লিয়াসের ৩০০ ইউনিট গঠন করা হয়। প্রতি ইউনিটে ৯ জন করে সদস্য ছিলেন। প্রতি মহকুমায় চার-পাঁচজন সদস্য থাকতেন। মহকুমার অধীনে বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঁচজন সদস্য নিয়ে গোপন কমিটি গঠিত হতো। ১৯৬৮-'৭০ সালে নিউক্লিয়াস-এর সদস্য বৃদ্ধি পেয়ে সাত হাজারে দাঁড়ায়। ১১ দফা আন্দোলনকে বেগবান করে শেখ মুজিবের মুক্তি ও এক দফার অর্থাৎ স্বাধীনতার আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়া হয় নিউক্লিয়াসের মাধ্যমেই। এক কথায় তখন ছাত্রলীগের উপরে পুরো কর্তৃত্ব ছিল নিউক্লিয়াসের। পরবর্তীতে শ্রমিক লীগ গঠিত হয় নিউক্লিয়াসের কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে এবং বলাই বাহুল্য, শ্রমিক লীগও পরিচালিত হতো বিপ্লবী পরিষদ বা নিউক্লিয়াসের নেতৃবৃন্দের দ্বারা।

বিপ্লবী পরিষদের জেলা ফোরাম গঠন করা হয় একজন নেতার নেতৃত্বে। যেমন, চট্টগ্রাম ফোরামের নেতৃত্বে ছিলেন আবুল কালাম আজাদ (অ্যাডভোকেট), কুমিল্লায় হাবিবুল্লাহ চৌধুরী (অ্যাডভোকেট), সিলেটে আক্তার আহমেদ (ক্যান্সারে '৮৪ সালে মারা যান), ফরিদপুরে মনোরঞ্জন, মাদারীপুরে আমির হোসেন (সাপ্তাহিক এই সময়ের সম্পাদক), বরিশালে জেড আই খান পান্না (অ্যাডভোকেট), খুলনায় মনোরঞ্জন দাস, যশোরে আলী হোসেন মনি, কুষ্টিয়ায় আব্দুল মোমিন, পাবনায় আহমেদ রফিক ('৭০-এর নির্বাচিত এমপি), বগুড়ায় মোস্তাফিজুর রহমান পটল ('৭৩-এর নির্বাচিত এমপি), দিনাজপুরে মাহতাব হোসেন, রংপুরে হারেশ সরকার (পরবর্তীতে বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত এবং এমপি, প্রয়াত)। ০৪ থেকে ০৭ জন সদস্য নিয়ে এ সমস্ত জেলা ফোরাম গঠিত হয়। এর বাইরে ছাত্রলীগ পরিচালনার জন্য একটি ছায়া ফোরাম গঠন করা হয়। এই ছায়া ফোরামের দায়িত্ব ছিল কাজী আরেফ আহমেদের উপর। এই ছায়া ফোরামের সদস্য ছিলেন মনিরুল ইসলাম (মার্শাল মণি), আসম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, স্বপন কুমার চৌধুরী। ১৯৬৯ সালে কারামুক্তির পরে বঙ্গবন্ধুকে নিউক্লিয়াস ও বিএলএফ-এর কর্মপদ্ধতি, সংগঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি উজ্জীবিত হন এবং তখন থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে

আপোষহীন হন।

বঙ্গবন্ধু বিএলএফ-এর হাই কমান্ডে শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদকে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন। তিনি সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদ এই চার যুবনেতাকে স্বাধীনতার প্রশ্নে প্রয়োজনে ভারতের সহযোগিতা নেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন এবং যে কোন পরিস্থিতিতে যোগাযোগের জন্য কলকাতার ভবানী রোডের একটা ঠিকানা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, এই ঠিকানাটা ছিল চিত্তরঞ্জন সুতারের এবং ২৫ মার্চের পরে এই চার যুবনেতা ওই ঠিকানাতেই মিলিত হন এবং গড়ে তোলেন মুজিব বাহিনী। একই বছরে ফোরামে যুক্ত হন শরীফ নুরুল আম্বিয়া, হাসানুল হক ইনু, মোস্তাফিজুর রহমান এমপি, মাসুদ আহমেদ রুমী (দৈনিক বাংলা), আ.ফ.ম মাহবুবুল হক।

ঢাকা শহরে আরও একটি ফোরাম কাজ করতো যার নেতৃত্বে ছিলেন মফিজুর রহমান খান (সাপ্তাহিক রুপম কাগজ-এর প্রকাশক)। সদস্য ছিলেন মফিজুর রহমান, শহীদ নজরুল ইসলাম, জাহিদ হোসেন, মনিরুল হক, বদিউল আলম কাউসার। এর বাইরে সিরাজুল আলম খানের দায়িত্বে আমিনুল হক বাদশা, চিত্তরঞ্জন গুহ এবং বোরহান উদ্দিন পুনম বিপ্লবী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হন। আরও যাঁরা বিপ্লবী পরিষদের সাথে জড়িত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন, কামরুল আলম খান খসরু ('ওরা এগার জন' সিনেমার নায়ক), চিশতী শাহ হেলালুর রহমান (শহীদ, প্রথম 'জয় বাংলা' উচ্চারণকারী), আফতাব আহমেদ, রায়হান ফেরদৌস মধু, রেজাউল হক মোস্তাক, গোলাম ফারুক প্রমুখ। ১৯৬২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সংগঠিত সবকটি আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এই গোপন সংগঠনটি। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডগুলো সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১) ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে গাড়িসহ বিভিন্ন যানবাহনের নম্বর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাটের নামফলক ইংরেজির পরিবর্তে বাংলায় লেখার আন্দোলন সংগঠিত হয়। নিউক্লিয়াসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলায় লেখার এই মৌলিক কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে ছাত্রলীগ।

২) একই সময়ে প্রথম দেয়াল লিখন (চিকা) ব্যবস্থা চালু হয় নিউক্লিয়াস-এর সিদ্ধান্তে। যা বাস্তবায়নের জন্য যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন।

৩) ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু লাহোরে ছয় দফা ঘোষণা করলে বাঙালির স্বাধিকার বিষয়টা সামনে চলে আসে। এটাই ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাথমিক ধাপ। বঙ্গবন্ধু যখন ছয় দফা ঘোষণা করেন তখন তাঁর পক্ষে বিপক্ষে বিতর্ক শুরু হয়। আর এই বিতর্ককে পাস কাটিয়ে সে সময়ের ছাত্রলীগের মহানগর সভাপতি কাজী আরেফ আহমেদ সর্বপ্রথম বিবৃতি দিয়ে ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানান এবং তাঁর নেতৃত্বে ঢাকার রাজপথে মিছিল বের হয়। এর পর পরই ছয় দফার প্রতি সমর্থন জানানো শুরু হয় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

৪) শেখ সাহেবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যা তখনকার ছাত্রলীগের সভাপতি (তোফায়েল আহমদ) কর্তৃক ১৯৬৯ সালে পল্টন ময়দানে ঘোষণা করা হয়।

৫) বাঙালির জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে 'বাংলাদেশ' নামকরণের সমর্থন, যা ১৯৭০ সালে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু উত্থাপন করেন।

৬) স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা,

আমি তোমায় ভালোবাসি' নির্ধারণ করে নিউক্লিয়াস।

৭) স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা তৈরি ও প্রদর্শন। ১৯৭০ সালের ৬ জুন রাতে ইকবাল হলের ১১৬ নম্বর রুমে পতাকা প্রস্তুত করা হয় যা পরের দিন পল্টনে বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই পতাকাই ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাবি'র কলাভবনের পশ্চিম পাশের ছোট গাড়ি-বারান্দার ছাদের সভামঞ্চ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করেন ডাকসুর তৎকালীন ভিপি আসম আব্দুর রব।

৮) ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রস্তাব পাস করানো ছিল নিউক্লিয়াসের সিদ্ধান্ত। আর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭০ সালের ২১ জুন বলাকা ভবনে ছাত্রলীগের সভায় নিউক্লিয়াসের সদস্য ও ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক স্বপন কুমার চৌধুরী এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং ৩৬ : ৯ ভোটে প্রস্তাবটি পাস হয়।

৯) ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ কর্তৃক স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ।

১০) সম্ভাব্য মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে আতাউল গনি ওসমানীর নাম বঙ্গবন্ধুকে সুপারিশ করে নিউক্লিয়াস।

১১) ১৯৭০ সালে শ্রমিক শ্রেণির সংগঠন 'শ্রমিক লীগ' গড়ে তোলা।

১২) মরহুম মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে ছাত্রীদের নিয়ে 'প্রীতিলতা ছাত্রী জঙ্গিবাহিনী' গড়ে তোলা হয়।

১৩) 'বিপ্লবী বাংলা' নামে গোপন ও 'জয় বাংলা' নামে প্রকাশ্য পত্রিকা এবং বুকলেট, লিফলেট ও পুস্তিকা প্রকাশ।

১৪) প্রবাসী সরকারের 'জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন।

১৫) স্বাধীনতার যাবতীয় প্রচার কর্মকাণ্ড 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে' পরিচালিত হওয়ার সিদ্ধান্ত প্রদান।

১৬) ১১ দফা আন্দোলন পরিকল্পনা এবং এর সাংগঠনিক বিস্তারে নিউক্লিয়াস-এর নেতৃত্ব ও সংগঠকরা নেপথ্যে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন এবং এ আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের রূপ প্রদানে নিউক্লিয়াস নেতাদের ভূমিকাই প্রধান ছিল। ১১ দফায় স্বাক্ষরকারী ছাত্র সংগঠনসমূহ হলো ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (উভয় গ্রুপ), ছাত্র ফেডারেশন (দোলন গ্রুপ) ও ডাকসু। ১১ দফা আন্দোলন চলাকালে গণঅভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালি অধ্যুষিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। নিউক্লিয়াস সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে বিকল্প সামাজিক শক্তি হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ব্রিগেড সারা দেশে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শহর-পাড়া-মহল্লাসহ প্রত্যেক অঞ্চলে এবং থানা পর্যায় পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছিল। নৈশ প্রহরী, ট্রাফিক ব্যবস্থা, মেইল ট্রেন চালু, লঞ্চ, স্টিমার, নৌবন্দর পরিচালনা, এমসিসি-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা পরিচালনা করা, থানা পর্যায়ে পুলিশ প্রশাসনকে সহায়তা করা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা, শিল্প কল-কারখানায় উৎপাদন অব্যাহত রাখা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনায়ও ব্রিগেডগুলোর ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ। ছাত্রনেতা আসাদ, কিশোর ছাত্র মতিউর পুলিশের গুলিতে নিহত হলে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কৌশল নির্ধারণ করে নিউক্লিয়াস এবং তা কার্যকর করে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'। গণআন্দোলন ক্রমেই তীব্র হতে থাকে এবং গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। ফলে আইয়ুব খান

পদত্যাগ করে ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন।

১৭) ৬ দফা, ১১ দফা এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার আন্দোলনকে এক দফায় রূপান্তর করে স্বাধীনতার বিষয়কে সামনে নিয়ে আসা। এছাড়াও 'জয় বাংলা', 'তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'পিন্ডি না ঢাকা? ঢাকা ঢাকা', 'ছয় দফা না এক দফা! এক দফা এক দফা', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'স্বাধীন করো স্বাধীন করো বাংলাদেশ স্বাধীন করো' এই শ্লোগানগুলো নিউক্লিয়াস থেকেই সৃষ্টি যা জনপ্রিয় করা হয় ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগের মাধ্যমে। উপরের আলোচনা থেকে খুব সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ১৯৬২ সালে গঠিত গোপন সংগঠন স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বা নিউক্লিয়াসই ধারাবাহিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে এসেছে।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

সোনার বাংলা বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন

ফারিয়া হোসেন বর্ষা

মুজিববর্ষ পালনের প্রাক্কালে এ জাতির উপলব্ধি বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু অভিন্ন। সকল অর্থে তিনিই বাংলাদেশ। সেটাই আজ মুজিববর্ষে আমাদের ভাবনা। বিশ্ববিখ্যাত আইনজীবী ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী সন ম্যাকব্রাইড বলেছিলেন: 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন, স্বাধীনতা বলতে শুধু পতাকা পরিবর্তন ও দেশের নতুন নামকরণ বোঝায় না, তাঁর দৃষ্টিতে স্বাধীনতার অর্থ হলো সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও নীতিবোধসম্পন্ন আদর্শবাদ'। ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি যখন দেখেছেন মুসলিম লীগ খেটে খাওয়া মানুষের নয়; বরং ভূস্বামী, জমিদার, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সংগঠনে পরিণত হয়েছে, তখন তিনি গঠন করেছেন 'আওয়ামী' বা সাধারণ মানুষের 'মুসলিম লীগ'। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৫০টি বৃহৎ শিল্প ইউনিটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে ৪৭টি বৃহৎ শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মাত্র ২কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে কৃষির অধিকতর বিকাশের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তদানিন্তন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য বেশি পরিমাণে বরাদ্দ দিচ্ছিল। বাংলাদেশের (তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের) কৃষকরা অতি উন্নত মানের পাট উৎপাদন করতো। অথচ এই পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি থেকে যা আয় হতো তার শতকরা ৯০ ভাগই ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানিব্যয় নির্বাহ করার জন্য। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের বৃহৎ শিল্পকারখানাগুলোও তুলে দেওয়া হয়েছিলো পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্প মালিকদের হাতে (যেমন : কর্ণফুলি পেপার মিল, প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিল)। পাকিস্তানে তখন চলছিল কতিপয় তন্ত্র। প্রায় সব ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল ২২টি পরিবারের হাতে। আর পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন নিয়ে ঐ কতিপয় তন্ত্রের সমর্থক কেন্দ্রীয় শাসকরা মোটেও ভাবতো না। বঙ্গবন্ধু এই ভয়াবহ বৈষম্যমূলক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে এ দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই যখন তিনি পূর্ব

পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছিলেন তখন সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন এ দেশে শিল্পের বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করতে। পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের একটি ন্যায্য অংশ যেন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) উদ্যোক্তা ও জনগণের কল্যাণে ব্যয় হয় তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে তিনি যথাসম্ভব দরকষাকষি করেছেন। প্রাদেশিক সরকারের শিল্প মন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রস্তাবনার সার-সংক্ষেপ ছিল এরকম:

*প্রাদেশিক সরকার আমদানির লাইসেন্স ইস্যু করার ক্ষমতা পাবে।

*পাট, তুলা ও তৈরি পোষাকের মতো শিল্পগুলোর নিয়ন্ত্রণ থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

*আমদানি-রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের একটি কার্যালয় স্থাপিত হবে পূর্ব পাকিস্তানে (অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে)।

*সাপ্লাই এবং ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের মহাপরিচালকের একটি পৃথক কার্যালয় পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত হবে।

*শতকরা ৫০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা যাবে পূর্ব পাকিস্তানে (আগে যাচ্ছিলো কেবল ১০ ভাগ)।

তিনি বাঙালির ম্যাগনাকার্টা বলে পরিচিত যে-ছয় দফা কর্মসূচি দিয়েছেন, সেখানেও রয়েছে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা। এজন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি বলেন: 'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবকশ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়'। (শেখ মুজিব বাংলাদেশের আরেক নাম, আতিউর রহমান, ২০০৯, দীপ্তি প্রকাশনী)। ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে বঙ্গবন্ধু বিশেষ ভাষণ দিয়েছিলেন। সে ভাষণে তিনি কৃষিবিপ্লবের কথা বলেছিলেন। ১৯৭২-৭৩ সালে ৫০০ কোটি টাকা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে ১০১ কোটি টাকা শুধু কৃষি উন্নয়নের জন্য রাখা হয়েছিল। কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে বঙ্গবন্ধু নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সদ্য স্বাধীন দেশের ত্রিশ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি পূরণে তাৎক্ষণিক আমদানি, স্বল্প মেয়াদে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, উন্নত বীজ, সেচ ও অন্যান্য কৃষি-উপকরণ সরবরাহ এবং কৃষকের মাঝে খাসজমি বিতরণ করে কৃষির উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের চেষ্টা করেন। কৃষিতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। উচ্চতর কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৭৩ সালের মধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি-অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করেন। পাকিস্তানি শাসনকালের দশ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি ও তাদের সকল ঋণ সুদসহ মাফ করে দেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরদিনের জন্য রহিত করেন। পরিবার পিছু জমির সিলিং ১০০ বিঘায় নির্ধারণ করেন। শক্তিচালিত সেচ পাম্পের সংখ্যা ১১ হাজার থেকে ৩৬ হাজারে উন্নীত করেন। এর ফলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লক্ষ একরে উন্নীত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি, সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে রেখে গেছেন অর্থনৈতিক দর্শন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দারিদ্র দূরের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যান বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এ দেশে ব্যক্তিখাতের বিকাশের বাস্তবতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। সদ্য

স্বাধীন হওয়া দেশে তাই বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্পখাতের বিকাশের যথোপযুক্ত নীতি গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর পর বঙ্গবন্ধু বড় বড় ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান, পাট ও চিনি কল এবং টেক্সটাইল কারখানা রাষ্ট্রীয়করণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সামাজিক সুবিচারে বিশ্বাসী ছিলেন। আর তাই এসব ব্যাংক-বীমা ও শিল্প কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে নেবার ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তটি তিনি নিয়েছিলেন। এবং এর প্রাথমিক ফলাফল ছিলো সত্যিই চমকপ্রদ। স্বাধীনতার প্রথম বছরের মধ্যেই দেশের পাটকলগুলো তাদের সক্ষমতার ৫৬ শতাংশ উৎপাদন করতে শুরু করেছিলো। টেক্সটাইল মিল, কাগজ কল এবং সার কারখানাগুলোর জন্য এ অনুপাত বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো যথাক্রমে ৬০ শতাংশ, ৬৯ শতাংশ এবং ৬২ শতাংশ। প্রাথমিক পর্যায়ে সঙ্গত কারণেই রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মাধ্যমে শিল্প বিকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও বঙ্গবন্ধুর মধ্যম ও দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনা ছিল ব্যক্তিখাতের বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের জাতীয় বাজেট প্রস্তাবনাগুলোর দিকে তাকালেই এর প্রমাণ মেলে। যেমন: ১৯৭৪-'৭৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ২৫ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকা করা হয় এবং ব্যক্তিখাতের উদ্যোগে শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগ রাখা হয়। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর সরকারের আমলেই পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া ১৩৩টি কারখানা ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর করা হয়েছিল। কাজেই বেসরকারি খাতকে বঙ্গবন্ধু উপেক্ষা করেছেন, এটা কখনো বলা যাবে না। ১৯৭৫ সালের শুরু থেকে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বাড়তে শুরু করল, কারণ আমরা যে-সাহায্য পেয়েছিলাম তার সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলাম। জনগণ সক্রিয় ছিল, একটি স্বাধীন দেশ ও এর উন্নতির দিকে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। কৃষি উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়ছিল, বৈদেশিক সাহায্যের সঠিক ব্যবহার বাড়ছিল, মূল্যস্ফীতি কমে আসছিল। সত্যি কথা বলতে, আমাদের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল। সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিচালনা করেই বঙ্গবন্ধু তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছেন। দেশের অর্থনীতিকে সচল করতে যেসব সৃজনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করেন তা শেষ করার মতো যথেষ্ট সময় তিনি পাননি। তবে ঐ উদ্যোগগুলো তিনি নিয়েছিলেন বলেই এতোদিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি মজবুত পাটাতন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার লড়াই করে গেছেন। হাত বাড়ালেই যে-নেতা ধরে ফেলতেন বাঙালির আশা, বাঙালির ভাষা আর বাঙালির কষ্ট, যে-নেতা সারাটা জীবন তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন বাঙালির অহঙ্কার, এই ছোট্ট পরিসরে তাঁর সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক দর্শন ব্যখ্যা করা অসম্ভব। বঙ্গবন্ধু বাঙালির দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, স্বপ্ন, সাহস নিজের মধ্যে ধারণ করেছেন আর তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন এক বিরাট স্বপ্ন–কী করে বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশাকে সত্যি করে তোলা যায়। তিনি বাঙালির অন্তরের গহীনে থাকা দুঃখ, বঞ্চনা, অপমান, স্বপ্ন, সাধ, সংগ্রাম নিমিষেই বুঝে ফেলতেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের সোনার বাংলা এখন আর স্বপ্ন নয়। বঙ্গবন্ধু-কন্যার হাত ধরেই এগিয়ে চলেছে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা। সোনার বাংলা এখন অনেকাংশে দৃশ্যমান বাস্তবতা। তাই মুজিববর্ষের প্রাক্কালে জাতির জনকের প্রতি বাঙালি জাতির অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা।

লেখক: প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

অসমাপ্ত আত্মজীবনী: আলোচনা-সমালোচনা

জয়নব তাবাসসুম বানু সোনালী

সমালোচনা করার জন্য গ্রন্থটি যদি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হয়, তাহলে গ্রন্থের সাথে সাথে গ্রন্থকারও সমালোচিত হন বৈকি। এর কারণ হল, সাধারণত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে গ্রন্থকারের নিজের জীবন ও জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে ঐতিহাসিক ঘটনার উপরে আলোকপাত করা হয়। সেক্ষেত্রে লেখকের বিবেক, ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা আর পাঠকের প্রতি আস্থা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাঁর লেখা বইটি অনেক সময় ইতিহাস বিকৃতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার অনেক সময় হয়ে উঠে কালের বিশেষ এক সাক্ষী যা কিনা তৎকালীন সময়ের লিখিত দলিল হিসেবে প্রকাশ পায়। তখন সেই আত্মজীবনী স্থান করে নেয় সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডারে। বিশিষ্টজনদের আত্মজীবনী তাই অনেক সময়ই সাহিত্যের মর্যাদায় আসীন। আমি যে আত্মজীবনী নিয়ে আলোচনা এবং সমালোচনা করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি, তার লেখক কোন কবি-সাহিত্যিক নন, তবে তাঁর লেখা ভীষণ সাহিত্যসমৃদ্ধ। তিনি একজন সফল রাজনীতিবিদ যাঁকে বলা হয় 'সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি'। প্রচলিত ধারার কবি না হলেও তাঁকে 'পয়েট অব পলিটিক্স' বলেও সম্বোধন করা হয়। এই কবি না হয়েও কবি যিনি, সাহিত্যিক না হয়েও যাঁর লেখা সাহিত্যগুণে গুণান্বিত, তিনি হলেন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' শীর্ষক বইটি সমালোচনা করার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না থাকলেও মূলত চেষ্টা থাকবে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শকেই তুলে ধরার।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে। এটি প্রকাশের গুরুদায়িত্ব ও এর ভূমিকা লেখার গুরুত্বপূর্ণ ভার বহন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। ভূমিকাটি তিনি ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে কারাবন্দী থাকা অবস্থায় লেখেন। তাঁর ভূমিকা থেকেই জানা যায় যে, স্বয়ং বঙ্গবন্ধুও ১৯৬৬-'৬৯ সালে কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দী থাকাকালেই ডায়েরিতে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ লিখে রেখেছেন। উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু তাঁর পারিবারিক ইতিহাসের কথা বিশদভাবে উল্লেখ করলেও বইটি ১৯৫৫ সাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, যে কারণে নামকরণে 'অসমাপ্ত' শব্দের সংযোজন

দৃশ্যমান। তবে একটা বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না, জেলখানার বন্দীজীবন যেখানে মস্তিষ্ককে শয়তানের কারখানা করে তোলে সেখানে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধু কন্যা দুজনেই জ্ঞান অর্জন ও উৎপাদন করার কাজে নিজেদের কারাবন্দী সময়কে প্রজন্মের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছেন। ইতিহাসে জনপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ, যাঁদের হাত ধরে বিপ্লব এসেছে এবং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যাঁদের কারাবন্দীও থাকতে হয়েছে, যেমন, নাজিম হিকমত, ফাইজ আহমেদ ফাইজ, কাজী নজরুল ইসলাম, ফ্রানস ফানো, আন্তনিও গ্রামসি, তাঁরা প্রত্যেকেই জেলে বসেই রচেছেন অসাধারণ কিছু বই। সেদিক থেকে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীও ইতিহাসের পাতায় একটি বৈপ্লবিক সংযোজন। ইতিহাসের প্রয়োজনে লিখিত এবং প্রকাশিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থগুলো অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসমাপ্তই দেখা যায়। উল্লেখ করা যেতে পারে, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের আত্মজীবনী 'দ্য অটোবায়োগ্রাফি অব বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন'-এর কথা, যা ১৭৭১ থেকে ১৭৯০ সালের ঘটনাসমূহকে কেন্দ্র করে লেখা। অথবা ওলন্দাজ ভাষায় লিখিত এবং ষাটোর্ধ্ব ভাষায় অনূদিত বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'দ্য ডায়েরি অব এনা ফ্রাঙ্ক'-এর কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এনা ফ্রাঙ্ককে তার বাবা অটো ফ্রাঙ্ক তার ১৩ তম জন্মদিনের উপহার হিসেবে ছোট্ট লকবিশিষ্ট একটি ডায়েরি উপহার দেন এই ডায়েরিতেই এনা ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তার দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা লিখে রাখে যাতে কিনা নাজিদের বীভৎসতাও দারুণভাবে উঠে আসে। মাত্র দুইবছরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা ডায়েরিটি ১৯৪৭ সালে ওলন্দাজ ভাষায় এবং ১৯৫২ সালে ইংরেজি ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়ে পৃথিবীজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ঘটনার সাথে আংশিক মিল আছে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী লেখার নেপথ্যের ঘটনার। জেলে থাকাকালীন সময়ে তাঁর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা রেণু তাঁকে অপরিমেয় অনুপ্রেরণার সাথে তিনটি ডায়েরি আর কলম উপহার দেন। স্ত্রী আর বন্ধুবান্ধবদের অনুপ্রেরণায় বঙ্গবন্ধু লিখেও ফেলেন এই অসাধারণ গ্রন্থটি। প্রথমেই লেখকের লেখনী নিয়ে আলোচনা করা যাক। লেখক সাহিত্যিক না হলেও যে সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন তা তাঁর সুস্পষ্ট, সুন্দর আর সাবলীল ভাষা পড়লেই বোঝা যায়। তাঁর লেখায় তেমন কোন দুর্বোধ্যতা নেই, বরং নদীর স্রোতের মত প্রবাহিত হওয়ার ক্ষমতা আছে। কিছু কিছু ঘটনার বর্ণনা তাঁকে সাহিত্যিক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে সহায়তা করেছে। ভালোবাসার নিদর্শন তাজমহল পরিদর্শন করে প্রায় একুশ বছর পরে তিনি তাঁর কবিসুলভ বর্ণনা দিয়ে নিজেরই কবিসত্তার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: 'সূর্য যখন অস্ত গেল, সোনালী রঙ আমাশে ছুটে আসছে। মনে হল, তাজের যেন আর একটা নতুন রূপ। সন্ধ্যার একটু পরেই চাঁদ দেখা দিল। চাঁদ অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে আর সাথে সাথে তাজ যেন ঘোমটা ফেলে দিয়ে নতুন রূপ ধারণ করছে। কি অপূর্ব দেখতে! আজও একুশ বৎসর পরে লিখতে বসে তাজের রূপকে আমি ভুলি নাই, আর ভুলতেও পারব না'। এমন বর্ণিল বর্ণনা পড়ে বলাই যায়, রবীন্দ্রনাথের মত তাঁর মাঝেও 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর মত কবিত্ব জেগে উঠেছিল। অর্থাৎ রোমান্টিক কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'কন্টিনিউয়াস ওভারফ্লো অব পাউয়ারফুল ফিলিংস রিকালেক্টেড ইন ট্রাংকুইলিটি'র যথাযথ বহিঃপ্রকাশ। যাহোক, লেখক একজন সফল রাজনীতিবিদ। রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে দেখলেই তাদের আত্মকেন্দ্রিকতা ও নিজেকেই নায়ক বানানোর অদম্য বাসনা চোখ পড়ে। সেখানে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতে তিনি নন, বরং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীই নায়ক এবং তাঁর রাজনৈতিক গুরু। তিনি লেখার শুরুতেই অকপটে স্বীকার করেছেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রতি। তাঁর হাত ধরেই মূলত ১৯৩৮ সাল থেকে অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স থেকে লেখকের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ঘটে। এমনকি তিনি শেরে বাংলা এ কে

ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা সম্পর্কেও ইতিবাচক বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে লেখকের রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও কোনভাবেই হক সাহেবকে পাঠকের কাছে তিনি হেয় করেননি। এই না হল সত্যিকারের নেতা! যিনি অন্যদের সম্মান দিতে জানেন, তিনি সকলের সম্মানের পাত্র হন। বঙ্গবন্ধু তাঁর পূর্বপ্রজন্ম এবং তাঁর সমসাময়িক নেতাদের যথার্থ শ্রদ্ধা দিয়েই লিখেছেন। তাঁর ভাষ্যমতে, এদের সবার অবদানেই তিনি সকলের আস্থাভাজন নেতা হয়ে উঠেছেন। তবে আমি মনে করি, A good politician, like a poet, is born, not made. ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ বাবা শেখ লুৎফর রহমান আর মা সায়েরা খাতুনের ঘর আলো করে জন্ম নেওয়া ডানপিটে মুজিব ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন নিজের খেলার দলের দলপতি। তাঁর অন্যান্য পূর্বপুরুষ শেখদের জীবন বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় কতটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবন যাপন করতে হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই মুজিব নানান রকম শারীরিক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছেন। তাঁর বাবা তাঁকে বেশি খেলতে দিতে চাইতেন না তাঁর 'হার্টের ব্যারাম' ছিল বলে। পরবর্তীতে ধরা পড়ে গ্লুকোমা, যে কারণে খুব ছোট বয়স থেকেই চশমা পরতে হয়েছিল তাঁকে। অবাক লাগে ভাবতে যে, গ্লুকোমা আর হার্টের ব্যারাম নিয়েই কিভাবে বঙ্গবন্ধু বাংলার স্বাধীকার অর্জনের প্রধান নেতা হয়ে উঠেছেন।

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের হাত ধরে যখন তিনি রাজনীতিতে এলেন, মুসলিম লীগ তখনও সাধারণ মধ্যবিত্তের দুয়ারে পৌঁছাতে পারেনি। ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় সোহরাওয়ার্দী ও লেখক সবাই মিলে মুসলিম লীগকে জনগণের লীগে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তখনও 'জেলায় জেলায় খান বাহাদুরের দলেরাই লীগকে পকেটে করে রেখেছিল'। বাবার অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে বঙ্গবন্ধু তখন সক্রিয়ভাবেই রাজনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েন। তবে তিনি আজীবন মনে রাখেন তাঁর বাবার বলা কথা, 'sincerity of purpose and honesty of purpose' থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না, যা তাঁকে সত্যিকার অর্থেই বিজয়ী করে তুলেছিল। রাজনীতিতে যোগ দিতে বললেও তাঁর বাবা সমসময় তাঁকে পড়াশোনার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। তাই লেখক নিজেই মনে করেন শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

বঙ্গবন্ধু সেসময় ভারতবর্ষে প্রচলিত স্লোগান দ্বারা আন্দোলিত হোন। স্লোগানটি ছিল, 'স্বাধীনতা আসে নাই, সংগ্রাম করে স্বাধীনতা আনতে হবে'। তিনি অনুধাবন করলেন যে, সংগ্রামের পথে একত্রে অগ্রসর হওয়ার মূল শক্তিই হল অসাম্প্রদায়িকতা। সেসময় হিন্দু-মুসলমানের দ্বেষ-বিদ্বেষের সুযোগ নিয়েই শোষকশ্রেণি তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে গেছে। তাই বঙ্গবন্ধু একটি অরাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কথাও ভেবেছিলেন, যার নাম 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। এটি মূলত 'কমিউনাল হারমোনি' ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ছিল যা বিভিন্ন উপায়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীকারের স্বপ্নের অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠে অসাম্প্রদায়িক চেতনার পুনর্নির্মাণ। বইটিতে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রয়েছে। ইতিহাস রুখে দাঁড়ানোর, প্রতিবাদের, প্রতিরোধের। জিন্নাহর উর্দুকে 'একমাত্র' রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে সূত্র ধরে বাংলার সর্বসাধারণের একত্র প্রতিবাদ জিন্নাহকে চুপ করতে বাধ্য করেছিল। লেখকের ভাষ্যমতে: 'জিন্নাহ যতদিন বেঁচেছিলেন আর কোনোদিন বলেন নাই, উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে'। লেখকের এমন মন্তব্যেই স্পষ্ট হয়, প্রতিবাদের ভাষা কিভাবে শোষিতের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে লেখক বাঙালির চরিত্রের নেতিবাচক দিকটিও সমালোচনা করেছেন: "আমাদের বাঙালির মধ্যে দুইটা দিক

আছে। একটা হল 'আমরা মুসলমান, আরেকটা হল, আমরা বাঙালি'। পরশ্রীকাতরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে। বোধ হয় দুনিয়ার কোন ভাষায়ই এই কথাটা পাওয়া যাবে না,'পরশ্রীকাতরতা'। পরের শ্রী দেখে যে কাতর হয় তাকে 'পরশ্রীকাতর' বলে। ঈর্ষা, দ্বেষ সকল ভাষায়ই পাবেন, সকল জাতির মধ্যেই কিছু কিছু আছে, কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে আছে পরশ্রীকাতরতা"। লেখকের এই অদ্ভুত সুন্দর বিশ্লেষণের এমন চমৎকার প্রকাশভঙ্গী সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। বইটিতে লেখক তাঁর ভ্রমণের কাহিনীও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ভ্রমণ হল কারা ভ্রমণ। এই ১৯৫৫ সালের মাঝেই লেখক বহুবার জেলে গেছেন পরিবারপরিজনকে ত্যাগ করে। তার বর্ণনা পড়লে অশ্রুসিক্ত না হয়ে পারা যায় না। তিনি লিখেছেন: 'একদিন সকালে আমি ও রেণু (লেখকের স্ত্রী) বিছানায় বসে গল্প করছিলাম। হাচু (হাসিনা) ও কামাল নিচে খেলছিল। হাচু মাঝে মাঝে খেলা ফেলে আমার কাছে আসে আর আব্বা আব্বা বলে ডাকে। কামাল চেয়ে থাকে। এক সময় কামাল হাচিনাকে বলছে, হাচু আপা হাচু আপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি। আমি আর রেণু দুজনেই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, আমি তো তোমারও আব্বা। কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে পড়ে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না। নিজের ছেলেও অনেক দিন না দেখলে ভুলে যায়! আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস'। কতটা ত্যাগ করলে এমন মহান নেতা হয়ে উঠা সম্ভব, তা কেবল উল্লেখিত উক্তি দিয়েই অনুধাবন করা যায়।

যাহোক, লেখক বঙ্গবন্ধু পুরোটা বই জুড়েই ভীষণ অমায়িক ও সত্যবাদী। তাঁর নিজের অপ্রস্তুত হয়ে যাওয়ার ঘটনাও তিনি অবলীলায় লিখে গেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে বাসর হোক বা হক সাহেবকে নিয়ে বলার পর জনগণের কাছে তাড়া খাওয়ার ঘটনাই হোক, সত্য প্রকাশে তাঁর কলমের কম্পন টের পাওয়া যায় না। তিনি ব্যক্তি এবং লেখক-দুই পরিচয়েই সত্যবাদী। চীন সফরে তিনি সমাজতন্ত্র নিয়েও তাঁর সত্য মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আজীবন পুঁজিবাদ, পুরুষতন্ত্র ও অসাম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তবে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পরে তেমন আর কোন ঘটনা পাওয়া যায় না বইটিতে। হয়ত তিনি লেখার সময় পাননি। তাই তার যবনিকা অসমাপ্তই থেকে গেলো।

'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অনুবাদক প্রফেসর ড. ফকরুল আলম। তাঁর অনবদ্য অনুবাদে বঙ্গবন্ধুর নিজের বয়ান কোনভাবেই হারিয়ে যায় না। কথায় বলে অনুবাদকের হাতে নাকি প্রায়শই লেখকের অকালমৃত্যু ঘটে। তবে এক্ষেত্রে বলা যায়, ফকরুল আলম বঙ্গবন্ধুকে আরো সজীব করেছেন বিশ্বসাহিত্যের দরবারে। বাংলাদেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন ছাত্রলীগে অংশ নিতে ইচ্ছুক তরুণ প্রজন্মের জন্য। ছাত্রলীগে অংশ নিতে দুটি বইয়ের উপরে শত নম্বরের একটা পরীক্ষা দিতে হবে। এই দুটো বই-ই বঙ্গবন্ধুর লেখা: 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা'। আমি মনে করি, শুধু লীগকর্মী না, এই প্রজন্মের সকলের জন্যই বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী একটি অবশ্যপাঠ হওয়া দরকার। সাধারণ ডানপিটে ছেলে থেকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হওয়ার সাক্ষী হল বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী '।

লেখক: প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

বঙ্গবন্ধুই হোক তারুণ্যের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ

আলী প্রয়াস

বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বে যে-ক'জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর বেড়ে উঠার দিকে তাকালে আমরা দেখি তিনি কী বিস্ময়রকমভাবে নিজেকে অপরিসীম উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন; কিভাবে বাংলার বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, হয়েছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি তথা স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, বাঙালি জাতির পিতা।

আমরা জানি, ইতিহাসই যুগে যুগে প্রবাদ পুরুষদের জন্ম দেয়। ইতিহাসের হাতে তৈরি হওয়া সেই ব্যক্তিরাই আবার ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে নিয়ামক হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন তেমনি একজন প্রবাদ পুরুষ। বঙ্গবন্ধু একদিনে তৈরি হননি, তিনি নিজেকে তিলে তিলে তৈরি করেছিলেন সংগ্রামী জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে। মানুষের হৃদয়ের গহীনে থাকা ভাষা তথা অনুভূতিগুলো তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন। এই যে বুঝতে পারার ক্ষমতা, তা-ই তাঁকে জনগণের কাতারে নিয়ে গিয়েছিল।

একজন মানুষ কিংবা বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর জীবনদর্শন অনেক গভীরতর ছিল। রাজনীতিক কুশীলব হিসেবে তিনি মানুষের ভালোবাসার সাথে নিজেকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র শুরুতেই আমরা তাঁর সেই পরিচয় পাই। তিনি বলেছেন: 'একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসেবে যা কিছু বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তা'ই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে'।

বঙ্গবন্ধুর প্রধান লক্ষ্য ছিল মানুষের মুক্তি, মানুষের কল্যাণ সাধন। সেই চেতনা থেকেই তিনি বাঙালি জাতির মনে সূর্যের আলো প্রজ্বলিত করেছিলেন, জাতিকে করেছিলেন আত্মসচেতন, জাগিয়েছিলেন

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বোধশক্তি। 'জয় বাংলা' দিয়ে বাঙালি জাতিকে একসূত্রে গেঁথেছিলেন। সেই সাথে বাঙালি জাতিকে একটি চেতনায়, একটি ভাবধারায় ও একটি আকাঙ্ক্ষায় তিনি ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। সর্বোপরি একটি স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের ভিত্তিতে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের যেসব ঐতিহাসিক অর্জন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন তার প্রতীক ও কেন্দ্রবিন্দু। আর তা সম্ভব হয়েছিল তাঁর অদম্য, একনিষ্ঠ দেশপ্রেম ও কৃতিত্বের কারণেই।

বঙ্গবন্ধুর মতো এমন তেজস্বী, দূরদর্শী ও সৎ সাহসী রাজনৈতিক নেতার আবির্ভাব এই বাংলায় আর কখনও ঘটেনি। ছাত্র অবস্থায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া শেখ মুজিবুর রহমান '৫২-র ভাষা আন্দোলনের একজন সংগ্রামী নেতা। বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফার প্রণেতাও ছিলেন তিনি। ষাটের দশক থেকেই তিনি পাকিস্তানের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়কে পরিণত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান '৭০-এর নির্বাচনে অংশ নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে এদেশের গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত করেন। তাঁর জন্ম না হলে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত না।

বঙ্গবন্ধুর সমগ্র জীবন ছিল ইতিহাসের অতুলনীয় এক মহাকাব্যের মতো। তিনি কেবল একজন ভালো মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন যে কারও আদর্শ হওয়ার মতো। ব্যক্তিগত গুণাবলী, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং অসামান্য চরিত্রমাধুর্যের সৌরভে অবিস্মরণীয় নেতাদের কাতারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। কূটনীতি ও রাষ্ট্রাচারের ক্ষেত্রেও বঙ্গবন্ধুর বিশাল ব্যক্তিত্ব ও সহনশীল আচরণ পরিলক্ষিত হয়েছে। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলেছিলেন: 'আমি হিমালয় দেখেনি, কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্বে, সাহসিকতায় এই মানবই হিমালয়'।

বাঙালি জাতির সৌভাগ্য যে এমন এক মহান নেতা পেয়েছিলেন। একই সাথে আমাদের দুর্ভাগ্যও যে তাঁকে আমাদের হারাতে হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে না থাকলেও ইতিহাসের মহাসড়কের পথ ধরে বঙ্গবন্ধু নিজস্ব পথ তৈরি করে দিয়ে গেছেন। তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনদর্শন তিনি বাঙালি জাতির জন্য অপার আদর্শ হিসেবে রেখে গেছেন। সে আদর্শ ধারণ করে বাঙালি এগিয়ে যেতে পারে সামনের দিকে। কেননা একটি জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকে তার অতীত ইতিহাস, বর্তমান কর্মকাণ্ড আর আগামী প্রজন্মের ভাবনার উপর। তরুণ প্রজন্মকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ও দেশপ্রেম। এই প্রজন্মের ছেলেরা যখন এখনকার রাজনীতিবিদদের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগিয়ে রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চায়, তখন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তাদেরকে তাঁর দেখানো পথে চলতে উৎসাহ জোগায়।

স্বাধীনতার প্রায় অর্ধশতকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেশের সামগ্রিক অর্জন, সংকট ও সম্ভাবনা আমরা খুঁজে দেখতে চেয়েছি; আর চেয়েছি এ অনুসন্ধান হোক তারুণ্যের চোখে। সেই তারুণ্য, যাদের প্রত্যেকের জন্ম স্বাধীন বাংলাদেশে, জন্মেই যারা পেয়েছে স্বাধীন দেশের স্বাদ, পরাধীনতার শৃঙ্খল বিষয়ে যারা

অনভিজ্ঞ এবং যারা দেখেনি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানি শোষণ সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ কোনো ধারণা নেই। প্রিয় বাংলাদেশ, যার সমৃদ্ধি আমাদের গৌরবান্বিত করে, যার ব্যর্থতা আমাদের বিদীর্ণ করে, সেই বাংলাদেশকে আরও বর্ণিল, প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধ করতে আজকের তারুণ্যের অপার সম্ভাবনাই যে সবচেয়ে বড় শক্তি, তা আমরা বিশ্বাস করি। পূর্ব প্রজন্মের গৌরব ও কীর্তি পরবর্তী প্রজন্মের স্পর্ধিত হাতে এগিয়ে যায় সামনে, এটিই সমাজ-প্রগতির শিক্ষা। তরুণদের ভাবনাগুলো হবে বাংলাদেশের ভাবনা, বাংলাদেশকে নিয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করার ভাবনা। তাদের অস্তিত্বে থাকবে বাংলাদেশ। তরুণদের কাজগুলো হবে বাংলাদেশের কাজ। তাদের সব স্বপ্ন হবে বাংলাদেশকে নিয়ে। তরুণদের এই ভাবনায় যুক্ত করতে হবে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর সুমহান আদর্শ।

বঙ্গবন্ধুর মতো পুরো জীবন মানুষের জন্য উৎসর্গ করার এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম যদি তাঁর অমূল্য জীবন-সংগ্রামের কথা না ভেবে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় তাহলে তা হবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তাই তাঁর লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' আর তাঁর ভাষণগুলো বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের অধ্যয়ন করতে হবে। টুঙ্গিপাড়ার শেখ মুজিবুর রহমান কিভাবে জাতির পিতা হয়ে উঠেছিলেন তা এখানে রয়েছে। আমাদের অভিভাবকদের উচিত বঙ্গবন্ধুর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও জ্ঞানের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি, মানুষের প্রতি আস্থা রাখা, স্বদেশের প্রতি নিজেকে নিয়োজিত করার যে দৃষ্টান্ত–তা শিক্ষা দেওয়া।

আজকের প্রজন্মের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মূল্যবোধের সেতুবন্ধন তৈরি করে দিতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তা অব্যাহত রেখে আমাদের দায়িত্ববোধের প্রমাণ রাখতে হবে। বাংলাদেশের একবিংশ শতাব্দীর তরুণ প্রজন্ম আগামী শতকের কাণ্ডারি হয়ে যে যার অবস্থান থেকে দেশের অগ্রযাত্রায় কাজ করতে হবে। তরুণ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর সাহসিকতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে অনুপ্রাণিত করতে হবে। তাহলে বাংলার মাটিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর যে-রক্ত মিশে আছে সেখান থেকে জন্ম হবে হাজারো বঙ্গবন্ধুর, যারা বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে জাতিকে উপহার দেবে অর্থনৈতিক মুক্তি এবং এনে দেবে মানবিক মূল্যবোধের প্রকৃত বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর অপরাজনীতির উল্লম্ফন ও বিচিত্র বিকাশ দেখে তরুণদের মনে রাজনীতি সম্পর্কেই অনীহা তৈরি হতে পারে। রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে কাজ করতেই হবে এমন নয়, দেশাত্মবোধের রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সচেতনতা খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে আমাদের স্বাধীন দেশের স্থপতি শেখ মুজিবই একমাত্র আদর্শ হতে পারে। দেশাত্মবোধের মানসচিত্তে নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠলে দেশ সোনার মানুষে ভরে উঠবে এবং সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশ সোনার বাংলা হয়ে উঠবে। বঙ্গবন্ধুর দর্শনের পথই আমাদের সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

এবছর পালিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ। এতে করে বর্তমান প্রজন্ম আরেক বিরল মুহূর্তের সাক্ষী হতে যাচ্ছে। আসুন এই জন্মশতবর্ষে জাতির পিতার আদর্শে দেশ গড়ার শপথ নিই। তাঁর প্রতি জ্ঞাপন করি গভীর শ্রদ্ধা।

লেখক : কবি ও প্রাবন্ধিক; সহকারী গ্রন্থাগারিক, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

পরাধীন বাঙালির ত্রাণকর্তা

শামসুল আরেফীন

বাংলার মানুষ শত শত বছর পরাধীন ছিল। সপ্তম শতকে শশাঙ্ক, অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত পাল রাজারা, দ্বাদশ শতকে সেন রাজারা, পরবর্তীতে সুলতান, আফগান, মোঘল ও নবাবরা এদেশ শাসন করেছে। এসব শাসক শাসক হিসেবে স্বাধীন ছিল বটে, কিন্তু বাংলার মানুষ কখনো স্বাধীনতা পায়নি, মানুষের মতো বাঁচার অধিকার পায়নি। এসব শাসকের, এমনকি তাঁদের অমাত্য-আমলাদের আদেশে অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়ে ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটতে পারতো।

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা ইংরেজদের কাছে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে বাংলা ইংরেজদের দখলে চলে যায়। এই ইংরেজরা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে এদেশকে শোষণ করতে শুরু করে। বলা বাহুল্য, বাংলা ছিল সম্পদের দেশ, প্রাচুর্যের দেশ। পনেরো, ষোলো ও সতেরো শতকে বিশ্ববিখ্যাত অনেক পর্যটক এদেশ পরিভ্রমণ করে এটা উপলব্ধি করেছিলেন। এক্ষেত্রে সিজার ফ্রেডারিক, নিকোলা মানুচি, ভারথেমা, জোআঁ দোবরোস, তাভার্নিয়ার, দুয়ার্তে বারবোসা, রাল্‌ফ ফিস ও বার্নিয়ার প্রমুখ পর্যটকের কথা উল্লেখযোগ্য। পর্যটক বার্নিয়ার বাদশাহ্ শাহজাহানের আমলে বাংলায় এসেছিলেন। তিনি দু'বার বাংলা পরিভ্রমণ করে তৎকালীন ফরাসী রাজা চতুর্দশ লুই-এর প্রধানমন্ত্রী কোলবার্টকে চিঠি লিখে জানান: বাংলা পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ।

ইংরেজরা ১৭৫৭ সালে সম্পদশালী এদেশ দখল করার মাত্র তিন বছরের মধ্যে এদেশ থেকে তৎকালীন ৫০০ কোটি পাউন্ডের সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করে। ফলে ১৭৬০ দশকে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়। এটা ছিল প্রথম শিল্পবিপ্লব। ইংরেজরা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৯০ বছর বাংলা ও বাংলার মানুষকে শোষণ করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটলে বাংলার মানুষ মনে করেছিল, তারা এবার স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের

পরপর বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষা বাংলা ষড়যন্ত্র কবলিত হলে, এদেশের মানুষ বুঝতে পারল তারা নতুন করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছে পরাধীন হলো।

ইতিহাস থেকে এসব তথ্য অবগত হওয়ার পর আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি, বাঙালির জন্য স্বাধীনতা কত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এটাও উপলব্ধি করেছি, বাঙালির বড়ো সৌভাগ্য হলো, শত শত বছর পরে হলেও তাকে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার খোকা–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পূর্বে রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯৩৯ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল পরিদর্শনে আসলে গোপালগঞ্জের অনুন্নত অবস্থার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিক্ষোভ সংগঠিত করে। শেখ মুজিবুর রহমান সে-সময় এই স্কুলের শিক্ষার্থী ছিলেন। ম্যাট্রিক পাশের পর তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাশ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি এই কলেজের ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের তিনি সদস্য ছিলেন ১৯৪৩ সাল থেকে। এছাড়াও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তিনি কর্মী ছিলেন। রাজনীতিতে এইচ. এস সোহরাওয়ার্দীর অনুসারী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ফরিদপুর জেলায় দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন।

তিনি দেশভাগের পরে সূচিত ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হন। এসময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য তাদের বিক্ষোভে শেখ মুজিবুর রহমানের উস্কানি ছিল, এই অভিযোগে ১৯৪৯ সালে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করেন।

১৯৪৮ সালে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের তিনি অন্যতম প্রধান সংগঠক হলেও, তাঁর প্রকৃত রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় তাঁর কারাগারে আটক থাকাকালে নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে। ১৯৫৩ সালে তিনি এই দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে তাঁর উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। ১৯৬৬ সালে তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। তবে তার পূর্বেই তিনি পাকিস্তানের লাহোরে ৬ দফা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশে এসে তিনি এই ছয় দফা ঘোষণা করেন চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে। এসময় উপস্থিত ছিলেন এম এ আজিজ, জহুর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ নেতা। এই ৬ দফা ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির দলিল। এই ৬ দফায় দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের অবয়ব ফুটে উঠেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে তা মেনে নেওয়া কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। এ কারণে আইয়ুব খান বলেছিলেন, শেখ মুজিবকে ৬ দফা প্রত্যাহার করতেই হবে। অন্যথায় তাঁকে যুক্তির ভাষা নয়, অস্ত্রের ভাষায় বোঝানো হবে। তারপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি করা হয়। এর পরের ঘটনা '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন ইত্যাদি।

পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনামলে বাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে

বঙ্গবন্ধু প্রায় ১১/১২ বছর জেল খেটেছিলেন। '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে তার ফল এলো। বাঙালিরা ৬ দফাকে সমর্থন করে আওয়ামী লীগকে ভোট দিলো। ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করলো আওয়ামী লীগ।

পাকিস্তান সরকার আওয়ামী লীগের এই বিজয় মেনে নিতে পারেনি। তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে। ফলে বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ বাঙালির সমাবেশে বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। কবি নির্মলেন্দু গুণ এই বিষয়টিকে তাঁর এক কবিতায় প্রকাশ করেছেন এভাবে:

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরিতে উঠিল জল
হৃদয়ে লাগিল দোলা
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা ।
কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী,
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি,
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঘুমন্ত নিরীহ বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, বঙ্গবন্ধু নিম্নোক্তরূপে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন:

> Pak Army suddenly attacked E.P.R. Base at Pillkhana, Rajarbag Police Line and killing citizens; street battle are going on in every street of Dacca, Chittagong. I appeal to the Nations of the World for help. Our freedom-fighters are gallantly fighting with the enemies to free the motherland. I appeal and order you all in the name of Almighty Allah to fight to the last drop of blood to liberate the country. Ask E.P.R., Bengal Regiment and Ansar to stand by you and to fight No compromise; Victory is ours. Drive out the last enemy from the holy soil of motherland convey this message to all Awami League leaders, workers and other patriots and lover of freedom. May Allah bless you.
>
> "JOY BANGLA"
>
> **Sk. Mujibur Rahman**

২৫ মার্চ রাতে চট্টগ্রামের তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমদ চৌধুরীর পরিবারে স্বাধীনতা ঘোষণার এই মেসেজ আসে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিবেশী এ কে এম মোশাররফ হোসেনের কাছ থেকে টেলিফোনে আসা এই মেসেজ রিসিভ করেন জহুর আহমদ চৌধুরীর স্ত্রী ডা. নুরুন নাহার জহুর। টেলিফোন নং: ৮০৭৮৫। মোশাররফ হোসেন পরবর্তীকালে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের পরে বিসিআইসির চেয়ারম্যান, শিল্প সচিব ও মন্ত্রী হয়েছিলেন। শিল্প সচিব ছিলেন ১৯৯০ সালে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ দুপুরে ও সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান এই মেসেজ অবলম্বনে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন।

এই ঘোষণার পর বাঙালিরাও নিজস্ব ভূ-খণ্ডে ও ভারতে সংগঠিত হয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে শুরু করে। তারপর দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধের মাধ্যমে ৩০ লক্ষ বাঙালির প্রাণ ও দুই লক্ষ মা-বোন-জায়ার সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা, অর্জিত হয় বিজয়।

আমি বিশ্বাস করি, শত শত বছর পরাধীন থাকা ও শোষিত হওয়া বাঙালিকে যিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন, সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঋণ বাঙালি কোনদিন শোধ করতে পারবে না। ইতিহাসে তিনি তাদের ত্রাণকর্তা, বাংলাদেশের স্থপতি ও বাঙালি জাতির জনক হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবেন।

তথ্য সহায়তা

১. বিচিত ভাবনা, ড. অনুপম সেন
২. অধিকার-সংগ্রামের বহ্নিশিখা শেখ হাসিনা, ড. অনুপম সেন
৩. ১৬ ডিসেম্বর : বাঙালির বিজয়ের দিন, মুক্তির দিন (প্রবন্ধ), ড. অনুপম সেন
৪. ড. অনুপম সেনের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বক্তৃতা
৫. বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার দুর্লভ দলিল, শামসুল আরেফীন
৬. কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র ও স্বাধীনতা ঘোষণা, শামসুল আরেফীন
৭. বাংলাপিডিয়া।

লেখক: লোকসাহিত্য ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক; সহকারী জনসংযোগ কর্মকর্তা, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

বঙ্গবন্ধু

অনিন্দিতা দাস মিমি

বাংলাদেশ-বঙ্গবন্ধু-মুক্তিযুদ্ধ-স্বাধীনতা এই শব্দগুলো এক সূত্রে গাঁথা। প্রত্যেকটি শব্দ বাংলাদেশের ইতিহাসে অভিন্ন, চিরকালীন, অবিচ্ছিন্ন এবং অবিনশ্বর। বর্তমান প্রজন্মের কাছে ১৯৪৮ পরবর্তী সংগ্রামগুলো হলো ইতিহাস এবং বঙ্গবন্ধু হলেন সেই ইতিহাসের মধ্যমণি।

বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সৎ, উদার, দেশপ্রেমিক, সাহসী ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পক্ষে আন্দোলন করতে গিয়ে নিজের ছাত্রত্ব হারান। তরুণ প্রজন্মের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে মুগ্ধ করে যে, মুচলেকা ও ১৫ টাকা জরিমানার বিনিময়ে নিজের ছাত্রত্ব ফিরে পাওয়ার সুযোগ পেয়েও অন্যায়ের সাথে তিনি আপোষ করেন নি। প্রত্যেকটি সংগ্রামে তিনি বাঙালিদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়েছেন এবং নিজের বিবেককে প্রশ্নবিদ্ধ করার এক বিন্দু সুযোগ কাউকে দেন নি, যা বর্তমান তরুণ প্রজন্ম এবং বাংলাদেশের সকল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আদর্শের একটি দৃষ্টান্ত। তিনি জীবদ্দশায় ৪ হাজার ৬৭৫ দিন কারাগারে কাটিয়েছেন মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য।

আমি মুক্তিযুদ্ধ দেখি নি, বঙ্গবন্ধুকে দেখিনি, কিন্তু তাঁর কর্মের দৃষ্টান্ত আমাকে বিস্মিত করে তোলে। বঙ্গবন্ধু সুভাষ বসুর দেশপ্রেম ও নেতৃত্ব এবং নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী চেতনার সমন্বয়ে এক মহীরুহ, যাঁকে এক শব্দ বা লাইনে প্রকাশ দুঃসাধ্য। আজীবন তিনি আভিজাত্য নিয়ে রাজনীতি করেছেন। তাঁর দৃঢ়তা ও একাগ্রতা পাকিস্তানি শাসকদের চিরকাল স্তম্ভিত ও ভীত করে রেখেছে। বঙ্গবন্ধুর জীবনে এমন অনেক ঘটনা আছে যা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, সেই সকল ঘটনার কিছু দিক এবং তাঁর থেকে নেওয়া কিছু শিক্ষা আমাদের প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা হলো:

১৯৪৭ সালের ৬-৭ সেপ্টেম্বর 'পূর্ব পাকিস্তান কর্মী সম্মেলনে' তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা সম্পর্কিত প্রস্তাব উপস্থাপন করে বলেন: 'বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের লিখার

বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক। সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তৎসম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনসাধারণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক এবং জনগণের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হউক'।

একজন নেতা হিসেবে তাঁর গণতান্ত্রিক চেতনা সেই সময় থেকেই দৃশ্যমান ছিল। জাতীয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভাষা আন্দোলনের সময় বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি ওই অবস্থায় দৃঢ় থাকলে ভাষা আন্দোলন অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারতো। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুরু এবং বঙ্গবন্ধু তাঁর এই মত পরিবর্তনের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে সমর্থন আদায় করেন। বঙ্গবন্ধুর এই পদক্ষেপ আমায় শেখায় নেতা হিসেবে গুরুজনদের সম্মান করে অধিকার আদায় করার দৃঢ়তাকে।

১৯৪৯ সালের অক্টোবরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আটক থাকা অবস্থায় শারীরিক অবস্থার চরম অবনতির পরেও তিনি নানান চিরকুটের মাধ্যমে দলকে আন্দোলন এবং কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশনা দিতেন। পরবর্তীতে মন্ত্রী হওয়ার পরে দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে ত্যাগের রাজনীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যা বর্তমান প্রজন্মকে তাঁর মতো নির্লোভ ও দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ হওয়ার এবং মানুষের জন্য কাজ করার প্রেরণা দেয়। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করেন, যা ছিল কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা। এই দাবি সম্মেলনের উদ্যোক্তারা প্রত্যাখ্যান করেন এবং বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। দেশে ফিরে তিনি ৬ দফা দাবির পক্ষে জনগণের সমর্থন আদায় করার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী প্রচার কার্য পরিচালনা করেন। ৬ দফা আদায়ের জন্য যখন বঙ্গবন্ধু সমস্ত জনগণের আস্থা পেয়ে যাচ্ছিলেন তখনই তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' (State vs. Sheikh Mujibur Rahman and others 1968, Section 121-A and 131)। ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু এবং আরও কতিপয় বাঙালি সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এই মামলা করে, যেখানে ১ নম্বর আসামি শেখ মুজিবুর রহমান। এই মামলায় উল্লেখ করা হয়, বঙ্গবন্ধুসহ ওই কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেন। এ মামলায় ছিল ১০০ পেইজের চার্জশিট, ২২৭ জন সাক্ষী এবং ৭ জন রাজসাক্ষী। সেই বছরের ১৯ জুন কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে ঢাকা সেনানিবাসে বিচারকার্য শুরু হয়। কাপুরুষ পাকিস্তানি জাতি তাঁর বজ্রকণ্ঠে এতটাই ভীত ছিল যে, তারা তাঁকে দমানোর জন্য হেন কোন ষড়যন্ত্র নেই যা করেনি। তারা দণ্ডবিধির ধারা পর্যন্ত সংশোধন করেছিল নিজেদের মন মতো বিচারকার্য চালানোর জন্য। রাষ্ট্রপক্ষের নানান সাক্ষীকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের মাধ্যমে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অপচেষ্টা চালানো হয়, যারা পরবর্তিতে সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী 'প্রতিকূল সাক্ষী' (hostile witness) প্রমাণিত হয়। কাপুরুষোচিত কার্যকলাপের দরুন গণআন্দোলন তথা উত্তাল ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের তোপের মুখে পড়ে আইয়ুব খান সরকার পিছু হটতে এবং এই মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়। এই ইতিহাস তরুণ প্রজন্মের একজন সদস্য হিসেবে আমায় শেখায় সত্য কখনো চাপা থাকে না এবং বঙ্গবন্ধুর মতো বলিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্তে সত্যের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করলে সর্বশেষ জয় সত্যেরই হয়।

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় তিনি বলেন: 'একটা সময় ছিল যখন এই মাটি আর মানচিত্র থেকে *বাংলা* শব্দটি মুছে ফেলার সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। *বাংলা* শব্দটির অস্তিত্ব শুধু বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেত না। আমি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আজ ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে এই দেশকে পূর্ব পাকিস্তানের বদলে *বাংলাদেশ* ডাকা হবে'। এ থেকে আমরা তরুণ প্রজন্ম এই শিক্ষা নিই যে, বঙ্গবন্ধু বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ করে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে শত ষড়যন্ত্রের পরেও প্রাদেশিক আইনসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে পাকিস্তানিরা রুখতে পারেনি। তাই তারা বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার জন্য নানান টালবাহানা শুরু করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা দেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানালে তিনি সে সরকারকে মেনে নেবেন না। এই কাপুরুষ নেতা শেখ মুজিব ও তাঁর ঘনিষ্ঠজনদেরকে নিজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার জন্য একটি গোপন বার্তা পাঠান। সেই বার্তায় বঙ্গবন্ধুকে ভুট্টোর সাথে কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য আহবান জানান যেখানে ভুট্টো থাকবেন রাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গবন্ধু থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। আবার একই সময়ে, ভুট্টো আসন্ন সরকার গঠনকে বানচাল করার জন্য ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ দিতে থাকেন। ১৯৭১-এর ৭ মার্চের ভাষণ পাকিস্তানি মুল্লুককে এতটাই ভয়ভীত করে তোলে যে, তারা আড়ালে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের রচনা করতে থাকে। ২৫ মার্চের ভয়াল কালরাতে সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে বঙ্গবন্ধু সেই রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। মূল ঘোষণার অনুবাদ নিম্নরূপ:

'এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক'।

সেই রাতেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের একটি জেলে কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়। পাকিস্তানি জেনারেল রহিমুদ্দিন খান বঙ্গবন্ধুর মামলা পরিচালনা করেন। মামলার আসল কার্যপ্রণালী এবং রায় কখনোই জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। এ মামলাটি 'লায়ালপুর ট্রায়াল' হিসাবে অভিহিত। তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া তাঁর সহকর্মীরা বলিষ্ঠ হস্তে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালনা করেন। তারপর দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ শেষে বিজয় অর্জিত হয়। বঙ্গবন্ধু ফিরে এসে দেশের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করেন। কিন্তু এসময়ে বঙ্গবন্ধুর অনেক শত্রু তৈরি হয়। কতিপয় দুর্বৃত্ত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। এই ঘটনা বাঙালির ইতিহাসকে অভিশপ্ত করে তোলে, বিশ্ববাসীর কাছে বাঙালিদের মাথা চিরকালের জন্য নিচু করে দেয়।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর শোকে পাথর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশে আসার জন্য যখন জার্মানির একটি এয়ারপোর্টে তাঁর পাসপোর্টটি ইমিগ্রেশন অফিসারকে দেখালেন, তখন সেই অফিসার পাসপোর্টটি দেখেই শেখ হাসিনাকে বললেন: 'ছিঃ তোমরা বাংলাদেশিরা খুব জঘন্য একটি জাতি, যেই মানুষটি তোমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন তাঁকেই তোমরা হত্যা করে ফেললে'? এর পরের ঘটনা আরও বেদনাদায়ক। সেই সময়ের পুরো এয়ারপোর্ট-এর মানুষরা দেখল শাড়ি পরা এক নারী চিৎকার করে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

বঙ্গবন্ধু হত্যার ঘটনা বাঙালি হিসেবে নৈতিকভাবে আমায় লজ্জিত করে, আরও লজ্জিত করে যখন শুনি ১৯৭৫ সালে বিবিসির শিরোনামে বলা হয়েছিল: 'শেখ মুজিব নিহত হলেন তাঁর নিজেরই সেনাবাহিনীর হাতে অথচ তাঁকে হত্যা করতে পাকিস্তানিরা সংকোচবোধ করেছে'।

তবে আমি এটাও বলতে চাই যে, কতিপয় দুর্বৃত্ত বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করলেও পুরো বাঙালি জাতির কাছে তিনি অসীম সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি বাঙালি জাতির জনক ও হাজার বছরে শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে চিরকাল বাঙালির অন্তরে বিরাজ করবেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

রেফারেন্স লিঙ্ক:

1. https://www.jagonews24.com/campus/news/123747

2. https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/207454/বঙ্গবন্ধুর-আদর্শ-বাস্তবায়নই-তার-প্রতি-সম্মান

3. https://www.channelionline.com/বঙ্গবন্ধুর-আদর্শ-যথাযথ-প/

4. https://albd.org/bn/articles/news/31506/রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন-ও-বঙ্গবন্ধু-শেখ-মুজিবুর-রহমানঃ-এম-আর-মাহবুব

5.http://www.ourtimebd.com/beta/2019/07/15/agartala-conspiracy-case-accused-deserve-state-honor/

6. https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1554142/বঙ্গবন্ধুর-অমর-বাণী

লেখক: শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ, ব্যাচ ৩৪

তরুণ প্রজন্মের চোখে শেখ মুজিব

হুমায়ুন কবির রাসেল

আমরা তরুণ প্রজন্ম, আমরা দেশের ভবিষ্যৎ। আমরা স্বাধীনতা দেখিনি, তবে যুদ্ধে আহত কোন মুক্তিযোদ্ধা বা কোন বই বা স্বাধীনতার চলচ্চিত্র দেখে অনুভব করেছি স্বাধীনতা কী! কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তখনকার মানুষগুলোকে! পৃথিবীর ইতিহাসে যে-সমস্ত দেশ যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আর এই স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে যাঁর নির্দেশে বাঙালিরা পাকিস্তানি হায়েনাদের নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় মৃত্যুকে আপন করে নিয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন বাঙালি জাতির অহংকার, নতুন প্রজন্মের কাছে মহানায়ক-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাঁর জন্ম ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। তাঁর জন্মই যেন হয়েছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য। খুব অল্প বয়সে সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভা করার কারণে বঙ্গবন্ধু প্রথম কারাবরণ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সময়ও কয়েকবার কারাবরণ করেছিলেন, জানান দিয়েছিলেন তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে আন্দোলন করার সময়ও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তরুণ প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন এক অনুপ্রেরণা যাঁর কথা ভেবে তরুণরা সাহস পায়, এগিয়ে যায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। তিনি তরুণদের জন্য জীবন সংগ্রামের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক আদর্শের প্রতীক। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কারিগর, মহান মনের মানুষ, সফল রাজনীতিবিদ। যে কোন আন্দোলন সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর জীবনী তরুণ প্রজন্মকে ভাবতে শেখায়। বঙ্গবন্ধু জীবনের অনেকটা সময় কারাগারে কাটিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর জীবনী পড়ে আমরা জানতে পারি তাঁর চিন্তা চেতনা ছিল তরুণদের নিয়ে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখেই পরবর্তীতে প্রতিবাদী হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বুঝেছিলেন, অধিকার পেতে হলে নীরব থাকলে চলবে

না। সবাইকে জাগাতে হবে, তাদের মনে গেঁথে দিতে হবে স্বাধীনতার মন্ত্র। এরপর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে জানানো বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে গোটা বাংলাদেশ সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন স্লোগান ছিল একটাই-'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার ত্রিশ লক্ষ লোক বুকের তাজা রক্ত দিয়েছিলেন, শহীদ হয়েছিলেন, দুই লক্ষ মা-বোন সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছিলেন স্বাধীনতার জন্য। দীর্ঘ নয়মাস চলেছিল এই যুদ্ধ। তারপর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ছিল অসহায় মানুষের সেবা করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা, ছোট বেলা থেকে বঙ্গবন্ধু এমন স্বভাবের ছিলেন। নতুন প্রজন্মের কাছে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার নায়ক বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু ছিলেন আপোষহীন এবং আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ একজন মানুষ। তাঁর চরিত্রের এ গুণটি আমাদের তরুণ প্রজন্মকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে।

বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম আমাদের তরুণ প্রজন্মকে মুগ্ধ করে। বঙ্গবন্ধু দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। তিনি সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন আর আমাদেরকে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। একজন ছাত্র হিসেবে আমার কাছে বঙ্গবন্ধু একজন আদর্শ মানুষ। তাঁর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ, গুণাবলী আমার কাছে অনুসরণীয়। মানুষকে একতাবদ্ধ করার অসাধারণ গুণ তাঁর ছিল। আমরা তরুণ প্রজন্মের সবাই যদি তাঁকে অনুসরণ করি তাহলে এই গুণাবলী আমাদের মধ্যেও নিয়ে আসা সম্ভব। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের অনেকেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে মেনেই এগিয়ে চলছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হার না মানা সংগ্রাম, কর্মময় জীবন ও আদর্শ থেকে দেশের তরুণ সমাজকে অনেক শিক্ষা নিতে হবে। তাহলেই তরুণ প্রজন্ম পারবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে।

লেখক: শিক্ষার্থী, সিএসই বিভাগ, ৪র্থ সেমিস্টার

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবনপঞ্জি

গ্রন্থনা: মোছাম্মৎ মেহেরুন্নেছা বেগম

জন্মস্থান: গ্রাম-টুঙ্গিপাড়া, মহকুমা-গোপালগঞ্জ, জেলা-ফরিদপুর।

জন্ম তারিখ: ১৭ মার্চ ১৯২০ সাল। পিতা: শেখ লুৎফর রহমান, মাতা: মোছাম্মৎ সায়রা বেগম। বঙ্গবন্ধু পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। ডাক নাম: খোকা।

শিক্ষা: ৭ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি, স্কুল-গিমাডাঙ্গা প্রাইমারী স্কুল, গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুল এবং পরবর্তীতে মিশনারী স্কুল। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাশ। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ.পাস। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি।

ছাত্র রাজনীতি: ম্যাট্রিক পাশ করার পূর্বে ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত হন। ১৯৪০ সালে শেখ মুজিব নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে যোগদান করেন। এক বছরের জন্য বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে ইসলামিয়া ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হন।

জাতীয় রাজনীতি: ম্যাট্রিক পাশ করার পর কলেজ জীবনের শুরুতে পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে জড়িত হন। মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সালে ফরিদপুরে কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ১১ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার হন। পরের বছর ২১ জানুয়ারি মুক্তি লাভ করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান: বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় ১১ মার্চ ১৯৪৮ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে শেখ মুজিব সহকর্মীদের সাথে গ্রেপ্তার হন।

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলন: নেতৃত্ব দেওয়ার দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা দাবি আদায়ে আন্দোলন শুরু করে, ধর্মঘটের ডাক দেয়।

শেখ মুজিব কর্মচারীদের দাবি সমর্থন করেন এবং নেতৃত্ব দেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে জরিমানা করেন। জরিমানার আদেশ প্রত্যাখ্যান করায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শেখ মুজিবকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯ এপ্রিল উপাচার্যের বাসভবনের সামনে তিনি অবস্থান ধর্মঘট করেন এবং পুনরায় গ্রেপ্তার হন।

আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক: ২৩ জুন ১৯৪৯ সালে রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত। শেখ মুজিব জেলে থাকাবস্থায় এই দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। জুনের শেষ দিকে মুক্তি লাভ করেন। দেশে খাদ্য সংকট চলছিল। মুক্তিলাভের পর খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে পুনরায় আন্দোলনে জড়িত হন।

ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব ও গ্রেপ্তার: খাদ্য সংকটের আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার হন। পরে মুক্তি লাভ করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের ঢাকা আগমনে আওয়ামী মুসলিম লীগের ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ায় আবারও গ্রেপ্তার হন।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ভূমিকা ও অনশন: পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ১৯৫২ সালের জানুয়ারি মাসে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে পূর্ব বাংলার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার জন্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি দিবস এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস হিসেবে পালনের জন্য শেখ মুজিব সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহবান জানান। এই দাবিতে শেখ মুজিব জেলখানায় অনশন পালন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বার শহীদ হন।

আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত: ৯ জুলাই ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে শেখ মুজিব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য: ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ আসনে ১৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে প্রতিপক্ষ মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিজ্জামানকে পরাজিত করেন।

মন্ত্রীর দায়িত্ব: ১৫ মে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সরকারের বন ও কৃষিমন্ত্রী হন। ৩০ মে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে।

'বাংলা' নামে ডাকার আহ্বান: ৫ জুন শেখ মুজিব গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ২৫ আগস্ট করাচীতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম ব্যবহারে আপত্তি জানিয়ে 'বাংলা' নামে ডাকার আহবান জানান।

আওয়ামী মুসলিম লীগের পুনঃ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত: আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ইতিপূর্বে ১৭ জুন আওয়ামী লীগের পক্ষে পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। দলের কার্যকরি সভায় ২৩ জুন পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে প্রস্তাব দেওয়া হয়। স্বায়ত্তশাসন প্রদান না করা হলে দলীয় সদস্যগণ আইন সভা থেকে পদত্যাগ করবেন এমন প্রস্তাব পেশ করা হয়। ১৯৫৫ সালের ২১ অক্টোবরে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে

দলের সাধারণ সম্পাদক পদে শেখ মুজিব পুনঃ নির্বাচিত হন।

কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রীর দায়িত্বঃ ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন শেখ মুজিব।

দলীয় সিদ্ধান্তে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগঃ আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার জন্য দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে সংগঠক হিসাবে শেখ মুজিবকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ কারণে ১৯৫৭ সালের ৩০ মে শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ।

চীন সফরঃ ২৪ জুন থেকে ১৩ জুলাই ১৯৫৭ পর্যন্ত শেখ মুজিব সরকারিভাবে চীন সফর করেন।

মিথ্যা মামলায় বারবার কারাবাসঃ ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সামরিক আইন জারি। ১১ অক্টোবর শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারাবাসের পর মুক্তির দিনে জেল গেট থেকে আবারও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৭ ডিসেম্বর ১৯৬০ হাইকোর্টে রীট আবেদনে মুক্তি পান। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে ১৮ জুন মুক্তি লাভ করেন।

১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পুনঃ নির্বাচিতঃ মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ সভাপতি এবং শেখ মুজিব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত। ১১ মার্চ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ১৪ দিন পূর্বে গ্রেপ্তার।

রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে কারাদণ্ড ও মুক্তিঃ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে মামলা। শেখ মুজিব ১ বছর কারাবাস করেন। হাইকোর্টের নির্দেশে মুক্তি লাভ করেন।

ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশঃ ১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলসমূহের সম্মেলন। সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে শেখ মুজিবের ৫ ফেব্রুয়ারি ঐতিহাসিক ৬ দফা পেশ।

১৯৬৬ সালের ১ মার্চ শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত এবং ৬ দফার পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে গণসংযোগঃ ৬ দফাকে বাঙালির মুক্তিসনদ আখ্যায়িত করে শেখ মুজিবের পূর্ব বাংলায় গণসংযোগ শুরু। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের কূটচালে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দায়ের ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। ১৯৬৬ সালের প্রথম ৩ মাসে ৮ বার গ্রেপ্তার হন শেখ মুজিব। জেলখানার অভ্যন্তরে ফৌজদারি আদালত স্থাপন করা হয় ও শেখ মুজিবের বিচার চলে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তঃ শেখ মুজিবকে ১নং আসামি করে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সৃজন (১৯৬৮)। মামলায় কতিপয় বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগ করা হয়। শেখ মুজিবকে ১৭ জানুয়ারি জেল থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেটে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা সেনানিবাসে আটক। বিশেষ আদালত স্থাপন করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে বিচার শুরু।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারে গণঅভ্যুত্থানঃ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারে ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন করে। আন্দোলনে

১৪৪ ধারা ভঙ্গ, কারফিউ উপেক্ষার ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও ই.পি.আরের গুলিতে বহু হতাহত। আন্দোলনকারী মতিউর, আসাদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা এবং মামলার আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক নিহত হবার পর গণঅভ্যুত্থান ঘটে।

শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তির আদেশ প্রত্যাখ্যান: আইয়ুব সরকার নতি স্বীকার করে। রাজনৈতিক সমস্যা উত্তরণে ১ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক আহবান করে শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তির ঘোষণা করা হয়। শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি: পূর্ব বাংলায় গণঅভ্যুত্থানে ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে। শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তি লাভ ঘটে।

'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান: ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবের জন্য কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সংবর্ধনার আয়োজন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়।

রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান: বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আহূত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। আওয়ামী লীগের ৬ দফা এবং ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবি উত্থাপন করেন। শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। ১৩ মার্চ গোলটেবিল বৈঠক ত্যাগ করেন শেখ মুজিব। ১৪ মার্চ ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন।

লন্ডন সফর: ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের পতন হয় এবং সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সামরিক শাসন জারি হয়। বঙ্গবন্ধু সাংগঠনিক সফরে লন্ডন গমন করেন ৩ সপ্তাহের জন্য।

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে পুনরায় নির্বাচিত: ১৯৭০ সালের ৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পুনরায় দলের সভাপতি পদে নির্বাচিত করে।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ও আওয়ামী লীগের সংখ্যাধিক্য আসন লাভ: সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে পাকিস্তানের জনগণকে শাসনতন্ত্র দেবার জন্য এক ব্যক্তি এক ভোট নীতিতে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতা অটুট রাখার জন্য লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার জারি করেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সাথে সাথে গণপরিষদ বিলুপ্ত করা হয় এবং প্রণীত শাসনতন্ত্র গ্রহণ বা বর্জন প্রেসিডেন্টের ইচ্ছাধীন রাখার বিধান বহাল রাখা হয়। আওয়ামী লীগ কার্যকরি পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। বঙ্গবন্ধু মুজিবের ৬ দফার পক্ষে এবং নির্বাচনে তাঁর দলকে ভোট দেবার জন্য ব্যাপক গণসংযোগ চলে। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮ টি আসনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

বঙ্গবন্ধু মুজিব আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা নির্বাচিত: জুলফিকার আলী ভুট্টোর দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই দলের প্রতি ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি: পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। একইভাবে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তবে পূর্ব পাকিস্তানে

একটি আসনও লাভ করতে পারেনি। গণতন্ত্রের বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নীতি লঙ্ঘন করে পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান এই দুই প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলনেতার কাছে দুই প্রদেশের ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করেন। বঙ্গবন্ধু মুজিব ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ এক বিবৃতিতে ভুট্টোর দাবির তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন: 'একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে'।

১ মার্চ ১৯৭১ অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত: ৩ মার্চ আওয়ামী লীগের হরতাল ঘোষণা: প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া-ভুট্টোর আঁতাত। প্রেসিডেন্টের মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক স্থগিত। বঙ্গবন্ধুর জরুরি বৈঠক আহবান। ৩ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহবান ও পালন। শেখ মুজিবের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ: বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশব্যাপী সর্বাত্মক ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি ঘোষণা করেন 'প্রত্যেকে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। ... রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব ... এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। ... এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা'।

৭ মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পূর্ব বাংলা পরিচালিত: প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কোন আদেশ বা নির্দেশ ৭ মার্চ থেকে বাংলার জনগণ মান্য করেনি। শেখ মুজিবের নির্দেশ বাংলার মানুষ মেনে চলে।

১৬ মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু: পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে ঢাকায় মুজিব-ইয়াহিয়ার বৈঠক শুরু। ভুট্টোর ঢাকা আগমন। ইয়াহিয়া-ভুট্টো বৈঠক। মুজিব-ইয়াহিয়ার ৯ দিনব্যাপী বৈঠক ব্যর্থ।

পাকিস্তান আর্মির বাংলাদেশ আক্রমণ: ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু মুজিবের সাথে আলোচনার আড়ালে ইয়াহিয়া-টিক্কা-রাও ফরমান আলি ও অন্যান্য সেনা কর্মকর্তাদের সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পূর্ব বাংলায় আক্রমণ করার এবং গণহত্যা চালানোর নীলনকশা চূড়ান্ত করেন। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া গোপনে পূর্ব বাংলা থেকে পলায়ন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে পৌঁছামাত্র সেনাবাহিনীকে 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিচালনার মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় আক্রমণ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণা: পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ রাত ১২ টার পরে বঙ্গবন্ধুকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায়। গ্রেপ্তারের আগে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে তাঁকে বন্দী অবস্থায় পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী ঘোষণা: বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকার গঠিত: প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৬ মার্চের বেতার ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেন। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে এবং সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে অস্থায়ী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। জেনারেল আতাউল গনি ওসমানীর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী ৯ মাসব্যাপী গেরিলা এবং নিয়মিত সেনাবাহিনী রূপে বাংলাকে শত্রুমুক্ত করতে যুদ্ধ করে।

পাকিস্তান কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রহসন: ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ফয়সালাবাদ (লায়ালপুর) জেলে বঙ্গবন্ধুর গোপন বিচার করে তাঁকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানায়।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়: ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ভারতীয় ও বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠন। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান লাভ ঘটে।

৮ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধুর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি: স্বদেশ প্রত্যাবর্তন: যুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টো রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করার পর বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি দেন। লন্ডন এবং দিল্লী হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন বঙ্গবন্ধু। তিনি ১০ জানুয়ারি ঢাকায় পৌঁছানোর পর অবিস্মরণীয় গণসংবর্ধনা লাভ করেন।

১২ জানুয়ারি ১৯৭২ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ: বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। এককোটি লোক ভারতে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়েছিল। নয়মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধকালে কৃষক চাষাবাদ করতে পারেনি। রাস্তা, পুল, কালভার্ট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। দেশের অর্থনীতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নাগরিকের অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে সহজসাধ্য ছিল না। বঙ্গবন্ধু দেশগড়ার কাজে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।

বঙ্গবন্ধুর ৬ ফেব্রুয়ারি ভারত গমন: ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু ভারতে যান। স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় ভাষণ দেন।

৩০ জুলাই বঙ্গবন্ধুর লন্ডন গমন: বঙ্গবন্ধু পিত্তকোষের সমস্যায় ভুগছিলেন। ৩০ জুলাই লন্ডন গমন করেন ও পিত্তকোষে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর লন্ডন থেকে জেনেভা গমন করেন।

বঙ্গবন্ধুর 'জুলিওকুরী' পুরস্কার লাভ: ১০ অক্টোবর বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে 'জুলিওকুরী' পুরস্কারে ভূষিত করে।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ও বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষর: পাকিস্তান কারাগার থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের এক বছরের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন সমাপ্ত হয়। ১৪ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।

৭ মার্চ ১৯৭৩ বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন: ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ও কার্যকর হবার পূর্বে বঙ্গবন্ধু ৪ নভেম্বর ১৯৭২ বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের তারিখ (৭ মার্চ ১৯৭৩) ঘোষণা করেন। সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩ আসন লাভ করে।

বঙ্গবন্ধুর জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান: আলজেরিয়ায় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু ৬ সেপ্টেম্বর সেখানে যান।

বঙ্গবন্ধুর জাপান সফর: ১৭ অক্টোবর জাপান সরকারের আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু জাপান যান।

ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য পাকিস্তান গমন: ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনের স্থান হিসাবে পাকিস্তান নির্ধারিত ছিল। বঙ্গবন্ধু বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম প্রধান দেশের সরকার প্রদান হিসাবে আমন্ত্রিত হন। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য পাকিস্তান গমন করেন।

বঙ্গবন্ধুর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগদান ও বাংলায় ভাষণ: ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব ভাবনা ১৯৭৫: বঙ্গবন্ধুর সরকার বিরোধীরা দেশে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পাটের গুদামসহ রাষ্ট্রীয় স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ করে। প্রকাশ্য দিবালোকে, এমনকি ঈদের জামাতে মুসল্লি হত্যা করে। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে নতুন পদ্ধতি আনয়নের জন্য দ্বিতীয় বিপ্লব ভাবনা শুরু করেন।

বঙ্গবন্ধুর সংবিধান পরিবর্তন ও রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি প্রবর্তন: ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের বিধান চালু হয়। নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক রাজনৈতিক দল' সংক্ষেপে বাকশাল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাকশালের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৫ আগস্ট ভোরে বঙ্গবন্ধু মুজিব নিহত হন: ঘাতকের হাতে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়া সমগ্র বাঙালির কাছে অচিন্তনীয় হলেও এই অবিশ্বাস্য ঘৃণিত কাজটি ঘটে ১৫ আগস্ট ভোরে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, মুক্তির পথপ্রদর্শক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবনে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী ও উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক অফিসারদের হাতে নিহত হন। সেদিন ঘাতকদল বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেছা, জ্যেষ্ঠপুত্র মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল, পুত্র লে. শেখ জামাল, কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল, দুই পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসেরকে হত্যা করে। ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ দাফনের পূর্বেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালোভী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ নিজেকে রাষ্ট্রপতি দাবি করেন রেডিও ঘোষণায়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ায় চিরনিদ্রায় শায়িত: বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ সেনা প্রহরায় টুঙ্গিপাড়ায় নেওয়া হয়। অনাড়ম্বরভাবে তাঁকে দাফন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ঢাকায় বনানী গোরস্থানে সেনা কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে দাফন করা হয়।

তথ্যসূত্র

১। নেতা ও রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার: আদালত নথিতে ও প্রসঙ্গ নেপথ্যে- খাইরুল ইসলাম, পাতা নং- ৩২৬ হইতে ৩৩৬, কামরুল বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ-২০১৯ আগস্ট।

গ্রন্থনাকারী: প্রভাষক, আইন বিভাগ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত হাতে আঁকা চিত্র ‘সূর্যমুখী’

চিত্রটি এঁকেছেন লুবাবা নাওয়াল আলম, শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ, ব্যাচ ৪১

গল্প

বঙ্গবন্ধু ও মকবুল

আবদুল মজিদ শাকিব

একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে ঘুম ভাঙল মকবুলের। তার আসল নাম কি তা সে জানে না। একটু একটু মনে পড়ে তার মা তাকে রাস্তার সামনে দাঁড় করিয়ে বলেছিল: 'বাজান! তুই এখানে খাড়া আমি আইতাছি'। মকবুল ডাক দিয়ে কার সাথে চলে গিয়েছিল। এরপর থেকে সে নিজেকে মকবুল মনে করতে লাগল। সে যে-বস্তিতে ছিল সেটা কি বস্তি ছিল সে নিজেও জানে না। ৪০-৫০ জন এক সাথে জগাখিচুড়ি হয়ে থাকত কোনরকম। দিনের আলোতে কেউ বের হতো না। রাত্রে যা একটু বের হতো কেউ কেউ সাহস করে, মকবুল তার মা ছাড়া কাউকেই চিনতো না। অপরিচিত মানুষ সব, বিভিন্ন বয়সের, এক সাথে পাক করে খেত। বয়স্ক কিছু মানুষ শুয়ে থাকত সারাদিন, মাটির উপর একটা কাপড় বিছায়ে শুয়ে থাকত আর কাশত। মকবুলকে দেখলে ইশারা দিয়ে ডাকত কেউ কেউ, সে যেতে ভয় পেত।

অপরিচিত মানুষরা সারাদিন কী করে তা দেখে দেখেই মকবুলের দিন কাটত। সে দেখতো কোন বিধবা মহিলা তার স্বামীর জন্য কান্না করছে, কোন বয়স্ক মহিলা তার সন্তানের জন্য; কেউ কেউ সারাদিন কোরআন পড়তো আর দোয়া করতো পরিবার-পরিজনের জন্য।

একদিন হেঁটে যাচ্ছিল মকবুল, তখন এক বয়স্ক মানুষ ডাক দিল। মকবুলের ভয় হচ্ছিল তবুও গেল মানুষটির কাছে। বুড়া মানুষটার চেহারা দেখে কেমন জানি মায়া লাগল মকবুলের। মকবুল বলল: 'কও'। বুড়া মানুষটা বলল: 'পানি আনতে পারবি, পানি'? মকবুল বলল: 'খাড়াও আনতাছি'। মকবুল ওর মায়ের বিছানায় যেয়ে পানি খুঁজতে লাগল। মকবুলদের বিছানাও একই। একটা কাপড় বিছায়ে মাটি থেকে বিছানা আলাদা করে রেখেছে। কয়েকদিনের পুরাতন আধোয়া কাপড় পড়েছিল বিছানার উপর যা দিয়ে বালিশ বানিয়ে ঘুমাতো মকবুল আর তার মা। মকবুল পানি খুঁজে পেল না কোনদিকে। অবশেষে পাশের একটা বিছানার পাশে একটা ডেকসিতে দেখে তার মধ্যে কিছু পানি।

ডেকসিটা কোন রকমে বুড়ার কাছে নিয়ে গেল। বুড়া মানুষটা শোয়া থেকে একটু বসল। পরনে একটা লুঙ্গি অনেক পুরাতন, একটা পুরাতন ময়লা জামা। 'আনসোস পানি' বলে বুড়া মানুষটা মকবুলের হাত থেকে ডেকসিটা নিয়ে ডেকসির কোনায় মুখ লাগিয়ে গড় গড় আওয়াজ করে পানি গিলতে লাগল। মকবুল হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তার মনে হল ২-৩ দিন ধরে লোকটা পানি খাইনি। পানি পান করা শেষে মকবুলের মাথায় হাত দিয়ে লোকটা বলল: 'তুই অনেক বড় হবি জীবনে, আল্লাহর কাছে তোর জন্য দোয়া করমো বাজান'। এরপর বুড়া বলে: 'তুই জানোস নি দেশে কী চলে' ? মকবুল মাথা নাড়িয়ে বলে: 'না'। বুড়া বলে: 'দেশে যুদ্ধ চলে বাজান, যুদ্ধ'। মকবুল বলে: 'যুদ্ধ কী' ? তখন বুড়া বলে: 'দেশে আমাদের রক্ত যারা চুষে খায় তাদের সঙ্গে লড়াই'। মকবুল কিছুক্ষণ হা করে বুড়ার দিকে তাকিয়ে থেকে মনে মনে বলে, কী যে বলে লোকটা! তারপর ডেকসি নিয়ে তার বিছানায় চলে যায়।

এখন সেই বিছানা আর নেই, তার মাও নেই। ফুটপাতের এক কোনায় শুয়ে থাকে সে। কোন কাপড়ও নেই, যেটা বিছানা থেকে মাটি আলাদা করে রাখবে। বালুর উপর শুয়ে থাকে। পুরাতন ময়লা কাপড়ও নেই মাথায় দেওয়ার জন্য। মাথায় রাস্তার বালি ময়লা সব লেগে থাকে।

অবশেষে চোখ খুলল মকবুল। ভোরের কুয়াশা দেখে মাথার উপর গাছের ফাঁকে। আজকের দিনটা মকবুলের অন্যরকম লাগছে। রাস্তার পাশে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মকবুল উঠে দাঁড়াল, মানুষগুলোর সাথে নিজেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল। সবার মুখে কেমন জানি হাসি। মকবুল কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পেল না। পাশেই ২-৩ জন মানুষ, বয়স ৩০-এর উপরে হবে, বলে: 'আইবো, এদিক দিয়া আইবো'। আরেকজন বলে: 'হুঁ, জেইল থেইকা মুক্তি পাইসে, আমাদের দেশ স্বাধীন করাইল'। আরেকজন চিল্লিয়ে বলে: 'ওইতো আইতাছে গাড়ি, ওইতো আইতাছে'। মকবুল অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির উপর। গায়ে সব ফুলের মালা, গুনলে শেষ করা যাবে না, চোখে বিরাট চশমা। তিনি ডান হাত দিয়ে সবার দিকে হাত নাড়াতে লাগলেন। সবাই তাঁর দিকে হাত নাড়াতে থাকল। সবার মুখে একটাই স্লোগান: 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'।

লেখক: গল্পকার ও শিক্ষার্থী, সিএসই বিভাগ, ব্যাচ ৩১

মুজিব

আবদুর রহিম

কিশোরটি ঘুম-ভাঙা চোখে আকাশপানে চেয়েছিল।
মুক্ত আকাশে ঈগল ছিল সেদিন নিশ্চয়
দেবতার আশীর্বাদরূপে।

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে কিশোরের চোখ ছিল দূর-দিগন্তে,
আকাশ ভরা ডানা-ভাঙা মেঘগুলো বড্ড এলো-মেলো,
স্বপ্নহীন পাখির ডানায় যেন অনন্তযাত্রা,
গণ্ডিময় বিচরণ, দেয়ালবদ্ধ বাঘের মত,
কখন সন্ধ্যে হবে অথবা আকাশে মেঘ করবে,
দূর আকাশের দেবতার ছিন্ন বাণীর মত
ডাক আসবে ঘরে ফেরার, বাঘের মত মেঘের।

কিশোর অবচেতনে দেখে।

মেঘের পরে মেঘ, উচ্ছন্নে যাওয়া মেঘ,
বিদ্রোহী মেঘ, আশাহত মেঘ, স্বপ্নবাজ মেঘ
স্বপ্ন-ভাঙা আগামীহীন মেঘ।

কিশোর এখন যুবক।

অগণিত যুবকেরা আকাশের কেন্দ্রহীন মেঘের মত
সে জীবনে স্বপ্ন ডানা মেলেনা,
কৌলিন্যের অপছায়ায় অসহায়।

যুবক বড়ই বিচলিত।

আড়পেতে যুবক শুনে বিদ্রোহী মেঘের কথা
মেঘেদের দিগন্ত ভ্রমণের ইচ্ছের কথা
সবুজ পাড় ঘেষা উপসাগরের লবণ পানিতে
আকাশ গম্ভীর করা দৈত্য-ভরা রাতে
আকাশ পেড়ে পানিতে নৃত্য করার ইচ্ছের কথা।

যুবক অনিমেষে থাকায়।

পাহাড় থেকে সমতলে
খাল-নদী থেকে সাগরে
গ্রাম থেকে শহরে
মণ্ডল বাড়ি থেকে হাজী বাড়ি
জেলেপাড়া থেকে মুন্দারপাড়া
মেঘ-যুবকের দল কিলবিল করে।
তারা গণ্ডিবদ্ধ থাকতে চায়না
দূরের বাদ্য শুনতে চায়না।
তারা আকাশ চায়, তারাভরা আকাশ
তারা জমিন চায়, মুক্ত সবুজ জমিন।

আমাদের ঈগল-যুবক
তাদের মুক্ত করেছে
আকাশ দিয়েছে
জমিন দিয়েছে।

সে দেবত্বভরা ঈগল-যুবকের নাম
জিওসের নামের মত তিন অক্ষরের,
মুজিব।

লেখক: কবি ও সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

শেখ মুজিবুর রহমান
তোমার কীর্তিগাথা চিরবহমান

অনুপ কুমার বিশ্বাস

কেবল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নয়, শ্রেষ্ঠ মহামানবের কথা বলছি;
যার পদাঙ্ক সদা অনুসরণ করে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের পথে চলছি।

মানবমুক্তির মহান অগ্রপথিক তুমি, গণতন্ত্রের সুযোগ্য প্রতিমূর্তি;
তোমার গুণ ও কর্ম স্মরণে পালন করছি শতবর্ষপূর্তি।

তোমার পবিত্র স্বপ্নে লালিত হোক বাঙালির চরম উৎকর্ষ;
যুগ-যুগান্তর থাকুক হৃদয়ে অমর মুজিবশতবর্ষ।

স্বভাব তোমার সদা সংগ্রামী, আন্দোলনের সাথে চিরসহবাস;
তাইতো বিত্ত-বৈভব নয়, ঠিকানা ছিল রাজপথ আর কারাবাস।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি সেতো তোমারি সুদূর প্রসারি চিন্তার প্রতিফলন;
যার পরিক্রমায় সৃষ্টি হলো বায়ান্নর মহান ভাষা আন্দোলন।

তোমার উত্থাপিত ৬ দফায় শাসকগোষ্ঠীর টনক নড়ে গেল,
পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসন সর্বপ্রথম ব্যাপক গুরুত্ব পেল।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নামে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মিথ্যা অভিযোগ;
বাঙালির সামনে নিয়ে এলো ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সুবর্ণ সুযোগ।

পূর্ব পাকিস্তানের নাম পাল্টে তুমিই তো রাখলে বাংলাদেশ;
নতুন সত্তা, নতুন অবয়বে, বিশ্বকে চেনালে তোমার স্বদেশ।

পরাধীনতার শেকল ভেঙেছ, বাঙালি পেয়েছে স্বাধীনতার স্বাদ;
যুদ্ধবিধ্বস্ত এই বাংলাদেশ গড়েছে বাঙালি মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ।

বাংলার মানুষের সীমাহীন ভালোবাসায় উপাধি পেয়েছ বঙ্গবন্ধু;
বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রনায়ককে পেছনে ফেলে আজ তুমি বিশ্ববন্ধু।

দেশের আপামর জনতাকে বেসেছ ভালো আপন সন্তানের মত,
জীবনভর নীরবে সহ্য করেছ প্রতিঘাত, ত্যাগ-তিতিক্ষা যত।

তুমি হলে পথপ্রদর্শক, আলোকবর্তিকা জাতি যখন দিকভ্রান্ত;
সঠিকভাবে দেশ পরিচালনায় তুমিই হলে সর্বসময়ের আদর্শ দৃষ্টান্ত।

'মৃত্যু মানেই সবকিছু শেষ' বোকা ঘাতকদের ভ্রান্ত ধারণা;
তারা কখনোই মুছতে পারেনি তোমার অবিনাশী আদর্শ, চেতনা।

আকাশ সম হৃদয় তোমার, অশেষ মায়া-মমতা, করুণা অন্তরে জমা;
নিজ হত্যাকারীরও বিচার না করে হয়ত করে দিতে নিঃশর্ত ক্ষমা।

তোমার অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশ যখন যোগ্য নেতৃত্বহীনা,
দৃঢ় হাতে দেশের হাল ধরলেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।

বাবার আদর্শ ও কন্যার সততা এ দুইয়ে পেল পূর্ণমাত্রা,
বিশ্বের বুকে সগৌরবে চলছে বীর বাঙালির জয়যাত্রা।

লেখক: কবি ও সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি

প্রিয় নেতা, শুভ জন্মদিন

হোমায়রা নওশীন উর্মি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
তুমি শাশ্বত অমলিন
কোটি বাঙালির হৃদয়ে
বেঁচে রবে চিরদিন।

৭ই মার্চের ভাষণ;
বজ্রকণ্ঠে শুনিয়েছিলে মুক্তির বারতা,
লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে এলো স্বাধীনতা।

আমরা এখন নই পরাধীন
পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে হয়েছি স্বাধীন
সে তোমারই অবদান,
তুমি না হলে এ দেশ কখনো হতো না স্বাধীন,
তবু রাতের আঁধারে পিশাচের দল কেড়ে নিল তোমার প্রাণ!

সে কথা ভেবে হৃদয় জুড়ে আজ শুধুই হাহাকার,
কে বলেছে তুমি আর নেই!
শহীদের শোণিতের মাঝে তুমি মিশে হয়েছো একাকার।

হে স্বাধীন বাংলার স্থপতি,
ভুলবো না তোমায় কোনদিন
জন্মশতবর্ষে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা
প্রিয় নেতা, শুভ জন্মদিন।

লেখক: কবি ও প্রভাষক, আইন বিভাগ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি